তপতীকে—

অঞ্জলি

আষাঢ়ের সকাল বেলার মেঘলা আকাশ অঞ্জলির লঘু চিত্তকে ভারী করে তুল্‌লো। চঞ্চল অঞ্জলি অচঞ্চলভাবে ঢাকার র‍্যাঙ্কিন্ ষ্ট্রীটের দোতলার বারান্দা থেকে নির্নিমেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। আকাশের ভাবখানা ছিলো গম্ভীর ও গভীর। তার ভিতরে কোন রঙের বিকাশ ছিলোনা, তার সবটাই যেন রবারে ঘসা।

এমনি সময় তা'র বন্ধুনী রাবেয়া দত্ত এসে তাকে ডাকলো। অঞ্জলি কোন উত্তর দিলোনা। রাবেয়া উপরে এসে হেসে বল্‌লে—আমাদের ডাক্ ভাই শুন্‌তে পাওনা?

অঞ্জলি তাকে বস্‌বার ইঙ্গিত করে বল্‌লে—ডাক্ শুন্‌তে পেলেই কি ভাই সাড়া দিতে হয়, একটু খেলিয়ে না নিলে যে চলে না।

রাবেয়া হেসে বললে—সেই অস্ত্রর ভাই এখানে প্রয়োজন নেই। তোমার বাণ তোমার তূণে তোলা থাক্; তা' সার্থক হোক্।

অঞ্জলি তাকালো—কিন্তু কথা বল্‌লো না।

রাবেয়া সেই দৃষ্টিকে অবহেলা করে বলে উঠ্‌লো—তুমি নাকি সুবীর বাবুকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছ?

কথাতে তিরস্কারের সুর ছিলো।

অঞ্জলি হাস্‌লো।

রাবেয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় উৎসুক নয়নে তাকিয়ে রইলো।

অঞ্জলি বল্লে—এমন কি অপরাধ হ'লো, রাবেয়া?

রাবেয়া উত্তেজিতহয়ে বলে উঠ্লো—তুমি কি পাগল হয়েছ! এই তো সেদিন এতো বড় অসুখ থেকে উঠ্‌লো—ক'দিন বাঁচবে বলা যায়না। তাকে বিয়ে করবার সখ্ হয় তোমার?

অঞ্জলি দৃঢ়ভাবে বললে—এ তো সখ্ নয় ভাই, এ যে আমার করতেই হ'বে। আমার যে আর কোন উপায় নেই!

কথাটা রাবেয়ার বিশ্বাস হ'লো না। সে মনে মনে ভাবলে, এটা হ'লো অঞ্জলির একটা খেয়াল। কিন্তু বিয়ে যে তামাসা নয়, এ কথা রাবেয়া তাকে কি ক'রে বোঝাবে!

সে বললে—তুমি এতদিন যা' বলে এসেছ, তা হ'লে সে সব কথা মিথ্যা?

অঞ্জলি অলসভাবে বললে—আমি এতদিন কি বলেছি?

রাবেয়া উৎসাহ পেয়ে বললে—তুমি না বলেছিলে যে তুমি কারুরা কাছে ধরা দেবে না? পুরুষই তার রূপ নিয়ে, তার বিত্ত নিয়ে তোমার কাছে এসে ধরা দেবে।

অঞ্জলি দৃষ্টি উন্নত করে বললে—তাই-ই বলেছিলুম বটে, কিন্তু তখন কি জানতুম যে মেয়েদের অহঙ্কার করতে নেই। নিজের মনের খবর জানা যে এতো শক্ত তা তো ভাই তখন জানতেম না। চিরদিন পুরুষকে অবজ্ঞা ক'রেই এসেছি, কিন্তু কে জানতো যে আমার অলক্ষ্যে অদৃষ্ট পুরুষ আমার সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ করবার আয়োজন করে রেখেছিলেন।

তার কথায় ভঙ্গিমার যে অভিনয়ের সুর বেজে উঠলো, রাবেয়ার কাছে তা ভালো লাগলো না। তাই সে একটু রুক্ষস্বরে বললে—যে স্বেচ্ছায় নিজের মর্য্যাদা খোয়াতে বসে, তার অসম্মান পদে পদে।

এ কথায় অঞ্জলির আজ রাগ হলো না। সে করুণ সুরে বললে—তুমি বুঝবে না, ভাই। এ জিনিষ বোঝাবার নয়। আমি আমাকে হরণ করে যা পেয়েছি, তা' যে আমারই নিজের। বাইরে থেকে তাকে তুমি বুঝবার চেষ্টা করো না।

রাবেয়া তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো; কিন্তু কোন কিছু বললে না।

অঞ্জলি নিজেই বলতে লাগলো—তুমি তো জানো সুবীর বাবু অসুস্থ হয়ে আমাদের বাড়ীতে আসেন। কারোর সেবার উপর তাঁর দাবী ছিলো না। পরীক্ষার পর দীর্ঘ দিনগুলো যখন আমার অলসভাবে কাটছিলো, তখন নিতান্ত সখ করেই আমি তাঁর সেবার ভার নিয়েছিলেম। বিশ্বাস কর রাবেয়া, তখন রোগীর ওপর আমার এক কণা স্নেহও ছিলো না। শুধু মা'র কাজকে হাল্কা করবার জন্যেই আমি তাঁর শুশ্রূষায় মন দিয়েছিলেম।

রাবেয়া খুশী হ'য়ে বললে—সংসারে যারা নিঃস্ব হয়ে এলো, তারা তোমার সেবার বিত্ত কি করেই বা আশা করে!

অঞ্জলি রাবেয়ার কথা লক্ষ্য না করে বলে উঠলো—দিনের পর দিন যখন আমি সুবীরবাবুকে সেবা করতে লাগলুম, তখন

সেই সেবাতে আমি আমাকে হারালেম। আমার যত্ন আমার প্রাণের স্নেহরসে আপ্লুত হয়ে যে রূপ ধরলে, তাতে অহঙ্কার ছিলো না। সেই সেবা করতে করতে আমি রোগীকে ভালবাসতে আরম্ভ করলুম, আজ মনে হয় তাঁকে যেন আমি গড়েছি—তাঁকে যেন আমি নব জীবন দিয়েছি, সেই জীবনে আমারই সব চেয়ে বড় অধিকার। আজ সুবীরবাবুর জীবন যেন আমারই সৃষ্টি, তাই তাঁর সঙ্গে আমার যোগ এতো গভীর মনে হচ্চে।

রাবেয়া বললে—অসুস্থ লোকের প্রতি করুণা হ'তে পারে কিন্তু তা' বলে তাকে ভালবাসা যায় না। ভালবাসায় যে মিলন, তাতে দুই গ্রহের থাকা চাই পরস্পরের আকর্ষণ। কিন্তু তোমাদের তো ভালবাসা নয়, এ-তো শুধু ঘটনার যোগাযোগ।

অঞ্জলি বল্‌লে—ভাই, বিশ্লেষণ করে তোমাকে বোঝাতে পারবো না। কারণ আমার ভালবাসা বিচারের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। সত্যি কথা, আমি সুবীরবাবুর কাছ থেকে কিছুই পাইনি। তাঁর ভীরু স্বভাব—তিনি আমাকে তাঁর ভালবাসা জানাতে সাহসই করেননি। কিন্তু আমি যখন তাঁকে প্রাণভরে সেবা করেছি, মন আমার ভরে উঠেছে। আমার ভিতর যে কল্যাণময়ী নারী আছে, আজ সে বাইরে এসে গর্ব্বিতা অঞ্জলিকে নিঃশেষ করে ফেলেছে। রাবেয়া, আজ যে আমি কতো নিঃস্ব, তুমি তা' জানোনা। যার প্রাণ পরের হাতে ভাই, সে যে এমনি অসহায়, এমনি নিঃস্ব হয়ে পড়ে!

কথাগুলি রাবেয়ার ভাল লাগলোনা। সে ভ্রূ কুঁচকে বল্লে—যে খেল্তে গিয়ে নিজের প্রাণ হারিয়ে বসে, সেই খেলোয়াড়ের প্রতি আমার এতোটুকু শ্রদ্ধা নেই। তাই তাই মেয়েদের এসব "মেলো ড্রামাটিক্" ঢং আমার ভাল লাগেনা। একজনকে সেবা করতে গিয়েই যদি প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে আস্তে হয়, সেই প্রাণের প্রতি দরদ্ আমার নেই।

অঞ্জলি চোখ বুজে রইলো—সে যেন নিজেকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। অঞ্জলি জানতো যে-মেয়ে নিজের প্রাণ হারিয়ে বসে, তার মর্য্যাদাবোধ নেই। সে কখনো কল্পনা করেনি যে সুবীরের মত্ ছেলেকে সে বিয়ে করবে। সুবীর ছিলো তাদের গ্রামের এক গরীব আত্মীয়ের ছেলে। এম, এ, পাশ করে সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলো। কিছুকাল জেল খাটার পর তার স্বাস্থ্য একদম ভেঙে যায়। অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য সে অঞ্জলিদের বাড়ীতে আসে। তার বাপ-মা কেউ জীবিত নেই। অঞ্জলির বাবা মিঃ সরোজ রায় ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসার, তিনি গ্রামস্থ লোকদের ভালবাসেন বলেই সুবীরের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেছিলেন। অঞ্জলির মা লাবণ্য দেবী বড়লোকের মেয়ে হলেও সুগৃহিণী, তাঁর খ্যাতিও ছিলো প্রচুর।

অঞ্জলি হেসে বল্লে—সত্যিই রাবেয়া, আমি কি করছি, জানিনে। কিন্তু একথা জানি যে আমার এ ছাড়া আর কিছু করবার উপায় নেই। সুবীর বাবুকে সেবা করে আমি প্রাণে যে মধু সঞ্চয় করেছি, তা আমি আর কাউকে দিতে পারবোনা।

রাবেয়া চট্ করে বললে—আর কাউকে নয়?

অঞ্জলি অসম্মতি জানালো।

রাবেয়া একটু মুচ্‌কি হেসে বললে—নীরেন বাবুকেও নয়?

নীরেনের নাম শোনা মাত্র অঞ্জলির চোখমুখ হাসিতে ভরে উঠ্‌লো। অঞ্জলি ও নীরেনের মধ্যে খুব ভাব, বাজারে গুজব যে তাদের বিয়ে হবে। নীরেন জমিদারের ছেলে, ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছে। প্র্যাক্‌টিস্ করবে কি-না ভাবছে। অঞ্জলিকে ছেড়ে সে ঢাকা ছাড়তে পারছে না। হাটুখোলা রোডে তাদের বাড়ী। তার মোটর আছে, রূপ আছে আর অঞ্জলিও আছে, তাই প্র্যাক্‌টিস্ না করার জন্য তাকে অনুতাপ করতে হয় না। ঢাকার সোসাইটি মহলে অঞ্জলি ছিলো আকর্ষণের বস্তু, অথচ অঞ্জলি ঠিক্ "সোসাইটি টাইপ্" ছিলোনা। অঞ্জলির রূপ ছিলো ব'লে অহঙ্কার ছিলো, কিন্তু কাউকে সে আঘাত করতো না। সে গান গাইতে জানতো বলে ছেলের দল এসে তার কাছে ভিড় করতো কিন্তু কাউকে সে বড্ড সঙ্গ দিতো না। তাতে রহস্য বেড়ে যেতো। সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বি, এ পরীক্ষা দিয়েছে। সে ছেলেদের সঙ্গে পড়তো, সবার সঙ্গে কথা কইতো কিন্তু কারোর কথাই যে তার প্রাণে দাগ কাটতো না, তা' ছেলের দল বুঝতে পারতো। ছেলেরা ভাবতো—সে অহঙ্কারী। অহঙ্কারের বস্তু অঞ্জলির প্রচুর ছিলো কিন্তু অহঙ্কারী সে ছিলো না।

অঞ্জলি চোখ বুজে বললে—না, নীরেন বাবুকেও নয়।

রাবেয়া চম্‌কে উঠ্‌লো। নীরেনের প্রতি রাবেয়ারও লোভ কম ছিলো না।

অঞ্জলি রাবেয়ার দিকে চোখ চেয়ে বল্‌লে—নীরেন বাবুকে ভালবাসি, এ কথাও ঠিক্। তাঁকে হয়তো বিয়েও করতাম। রাবেয়া, তুমি তো জানো যে আমার যৌবনে প্রেমের চোখে এক আমি নীরেন বাবুকেই দেখেছি। নীরেন বাবুর আবেদন প্রত্যাহার করবার শক্তি আমার নেই বটে, কারণ আমার যৌবন তাঁকে চায়। কিন্তু সুবীর বাবুকে যে আমি গড়ে তুলেছি, সে যে নিতান্তই আমার। সে যদি এতো অসহায় না হতো, তাহ'লে বোধ হয় তাকে এতো নিবিড় ভাবে চাইতেম না। সুবীর বাবুকে আমি চাইনে, কারণ সেখানে পাওয়ার বালাই নেই। কিন্তু একথা আমি বুঝেছি যে সুবীর বাবুকে আমি ছাড়তে পারিনে—আমার ভিতর যে কল্যাণময়ী নারী ছিলো, তাকে সে জাগিয়ে দিয়েছে।

রাবেয়া অঞ্জলির কথার গতি বুঝতে পারলো না। রাবেয়া বল্‌লে—যাকে পেতে ভাই চাইতে হয় না, সে যে বিষম দায় হ'য়ে উঠ্‌বে।

অঞ্জলি অন্যদিকে তাকিয়ে বল্‌লে—আজ যে অঞ্জলির সঙ্গে কথা কইচ, সে যে সুবীর বাবুর গড়া। তাই আমি সজোরে প্রচার করেছি যে সুবীর বাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে। এই ভয়ে, পাছে নীরেন বাবু এসে তাঁর আবেদন জানান্।

রাবেয়া জিজ্ঞাসা কর্‌লে—যদি জানান্?

অঞ্জলি চঞ্চলভাবে উত্তর দিলো—সে প্রশ্ন ভাই আমাকে করো না।

রাবেয়া বললে—তুমি কি যৌবনকে অস্বীকার করে এই যৌবন কাটিয়ে দিতে পারবে?

অঞ্জলি নিরুপায় ভাবে বললে—কাটিয়ে দিতে পারবো কি না, জানিনে।

তারপর অঞ্জলি হেসে বললে—যদি না-ই পারি, প্রায়শ্চিত্তের তাপে নিজকে দগ্ধ করে ফেল্‌বো।

রাবেয়ার বড় বড় চোখ্‌ ছুটি ছল্‌ ছল্‌ করে উঠ্‌লো। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেলো।

অঞ্জলি চোখ চেয়ে জিজ্ঞাসা করলো—রাবেয়া, তুই নীরেন বাবুকে বিয়ে করবি?

প্রশ্ন শুনে রাবেয়া হো হো করে হেসে উঠ্‌লো। কিন্তু সে যত জোরে হাস্‌বে মনে করেছিলো, তত জোরো সে হাস্‌তে পারলো না।

হাসির পর ছুজনেই চুপ করে রইলো, যেন ছুজনের কথাই ফুরিয়ে গেছে।

আষাঢ়ের আকাশ তখনও পরিষ্কার হয়নি।

অঞ্জলির মা লাবণ্য দেবী মেয়েকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি সুবীরকেই বিয়ে করবে ?

অঞ্জলি সম্মতি দিয়ে বল্‌লো—আমি তো সেই কথাই বলেছি।

মা মেয়েকে আদর করে বল্‌লে—এ-তো মা জিদের কথা নয়। যা বল্‌বে, তা' যেন সত্যিকারের কথা হয়।

অঞ্জলি মা'র বুকের ওপর নিজের মাথা রেখে ডাক্‌লে—মা ?

মা মেয়েকে চুমো দিয়ে বল্‌লে—তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াবো না। সুবীরের অর্থ নেই বলে যে আমার আপত্তি, তা নয়—কারণ আমাদের বিত্ত তো আর পরকে দিয়ে যাবো না। কিন্তু তুমি সুবীরকে পেলে খুসী হ'বে, একথা আমাকে বিশ্বাস করতে দাও, অঞ্জলি।

অঞ্জলি একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। তারপর বল্‌লে—মা, তুমি কি বিশ্বাস করো যে মেয়েরা নিজেদের মনের কথা জানে। মেয়েরা যাকে পায়, তাকে নিয়েই গড়তে থাকে। তারা কি ছাই কাউকে অর্জ্জন করতে জানে।

লাবণ্য দেবীর প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়লো। সে ও তখন নিজেকে প্রশ্ন করেছিলো যে একজনের পক্ষে দু'জনকে ভালবাসা সম্ভব কি না। কিন্তু একজনকে যখন সহজ ভাবে পেলো, আর একজনকে কি কঠিন ভাবেই সে বর্জ্জন করেছে। আজ সে পুরাণো কথা মনে হয় যেন স্বপ্ন।

লাবণ্য দেবী মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর অলসভাবে বল্লেন— তা হ'লে নীরেনকে কি বলবে?

অঞ্জলি আশঙ্কা করছিলো পাছে নীরেনের কথা উঠে। নীরেন ছিলো তার যৌবনের প্রথম স্বপ্ন। তার যৌবনের সৌরভ নীরেনকে বিমুগ্ধ করেছিলো। সে কথা সে ভোলেনি, কারণ সে ভুলতে পারেনা। কিন্তু সুবীর হয়েছে তার নব জীবনের অগ্রদূত—তাঁকে সেবা করতে গিয়ে সে যে রসের স্বাদ পেয়েছে, তা' তার জীবনে ছিলো অনাবিষ্কৃত। সেই রসস্রষ্টাকে আজ সে অবহেলা করতে পারছে না।

অঞ্জলির একবার মনে হ'লো সে যেন দুজনকেই ভালবাসে এবং বাসবে। নীরেন যেন তার যৌবনের সাথী, আর সুবীর যেন তার প্রাণের বন্ধু। গৃহ গড়বে সে সুবীরকে নিয়ে, বাইরের বিশালতা ভোগ করবে সে নীরেনকে পেয়ে। নীরেনকে সে চায় কিন্তু সুবীরকে তার পেতে হবে।

অঞ্জলির ভয় হ'লো পাছে নীরেন তার দাবী না ছাড়ে। অঞ্জলির বরাবরই সন্দেহ ছিলো যে নীরেনের প্রার্থনা সে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। সুবীরের দাবী নেই—জোর নেই। নীরেনের সব আছে, অথচ নীরেনকে মুছে ফেলবার এতো চেষ্টা। সুবীর অঞ্জলিকে না পেলে হয়তো ভেঙে যাবে। সে কারোর জীবন-পথে পরগাছা হয়ে বাধা দেবে না। অথচ সেই অবলম্বনহীন সুবীরকে নিরুপায়ভাবে জীবন-স্রোতে ফেলে দিতে সে পারছে না। নারীর মনের বীণায় যে অনুকম্পার সুর আছে, তা' যে স্পর্শ

করতে পেরেছে, সে নারীর মনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। নারী যেখানে প্রেমিকা, সেখানে সে সাবধানী কৃপণ, কিন্তু নারী যেখানে কৃপা বিতরণ করে, সেখানে সে দানশীলতার ঐশ্বর্যে ধনী। জীবনে যে অসহায়, সংসার পথে যে কাঁচা, নারী তাকে পৃথিবীর স্রোতের মোহনায় ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

নীরেনের সব আছে—যার চলতি পথে সমস্ত পরগাছা বিদূরিত, পাশে পাশে যার ফুলের সৌরভ, জীবনের রাজপথে যার রথ পথিকদের ব্যঙ্গ করে এগিয়ে যাচ্ছে, চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে যার জয়ধ্বনি—সেই ঐশ্বর্যশালীর সংসার-পথে অঞ্জলি তার কতটুকু? তার মনে প্রশ্ন জাগলো যে এ কৃতী সন্তানের কোলাহল-ময় জীবনে অঞ্জলির বাণীর কোন সার্থকতা আছে কি না।

অঞ্জলি আর ভাবতে পারলো না। ভাবতে গেলেই যেন নীরেন-সমস্যা আরো জটিল হয়ে আসে। তার মনে হ'লো যে এর চেয়ে ভালো চোখ-কাণ বুজে জীবনকে নিয়ে জুয়া খেলা। তাই মনে হ'লো, খেলেই দেখা যাক্ না—কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

অঞ্জলি একবার মায়ের দিকে তাকালো। অঞ্জলির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। মা'র মন ছ্যাঁক্ করে উঠলো। বুঝলেন যে অঞ্জলি সুবীরকে ছাড়বে না, অথচ সে নীরেনকে চায়। নারীর মনের এই দু'মুখো রুচিকে লাবণ্য তাঁর জীবনে আঘাতে আঘাতে খেলে নিয়ে এসেছেন। তিনি জানেন যে এই আঘাত করতে গিয়ে তিনি নিজে কতটা আঘাত পেয়েছেন। তাই মেয়ের কথা মা'র মনে দ্বিগুণ হয়ে লাগলো।

লাবণ্য বললেন—সুবীরকে বুঝিয়ে বললে সে হয়তো তোমাকে মুক্তি দেবে।

অঞ্জলি তৎক্ষণাৎ বলে উঠ্‌লো—ছিঃ!

মনে হ'লো সুবীরকে এসব কথা বল্‌লে সে নিজে ছোট হয়ে যাবে। সুবীরের কাছে যে সে দেবী—অমরাবতীর কীটহীন কুসুমে রচা তাঁর মন, পৃথিবীর পাপ লোকের অনেক উর্দ্ধে সে যে; নীরেনের কাছে সে দুর্ব্বল, সেখানে রক্তের আকর্ষণ, যৌবনের প্রলোভন। সেখানে তার আসন কলঙ্কিত হলেও সে নিজে কলঙ্কিত হ'বে না। কিন্তু সুবীরের শ্রদ্ধাঞ্জলি যে সে গ্রহণ করেছে, তাকে সে দেবী হয়ে অযাচিতভাবে বর দিয়েছে, সেখানে তার আসনকে লুণ্ঠিত হতে দেবে না। দেবীর অপমান নারী হয়ে সে সহ্য করবে না।

দেবীর অপমানকে এড়াতে গিয়ে আজ তার নারী অপমানিত হ'বে। অঞ্জলির মনে হ'লো নীরেন তাকে কতো ছোট ভাববে। আরো হয়তো কত কি ভাববে কিন্তু শুধু বুঝবে না যে অঞ্জলি নারী হয়ে কতোখানি হারিয়েছে। অঞ্জলি হারাবার দুঃখ সহ্য করতে পারে কিন্তু নীরেনের ভুল বোঝা সে কি করে সারা জীবন বহন করে বেড়াবে। যে মুহূর্ত্তগুলিই সে নীরেনকে সঙ্গ দিয়ে সিঞ্চিত করে রেখেছে, নীরেন যদি সেই মুহূর্ত্তগুলিকে আজ প্রতারণা বলে মনে করে, তার কি কৈফিয়ৎ আজ রইলো? কিন্তু সে তো জানে তা' কতো সত্য, কতো অনাবিল, কতো শুভ্র।

লাবণ্য বললেন—মনকে ভাল করে বোঝতে শেখো, অঞ্জলি।

আজ যে-কথা বলবে, চিরকাল সে-কথাকে সত্য বলে মানতে হ'বে। আমাদের মনের দিকে তাকিয়ো না, আমরা তোমার সমস্ত ব্যবহারকে ক্ষমা করবো। কিন্তু তুমি যদি নিজেকে ক্ষমা করতে না পারো, সে দুঃখ যে চিরকালের।

অঞ্জলি বল্‌লে—মা, আজ যে কথা বুকের দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরুচ্ছে, তা যেন সত্য হয়, এই আশীর্ব্বাদই করো।

অঞ্জলি তার মা'র কাছ হ'তে কোন দিন কিছু গোপন করে নি। আজ যেন মনে হ'লো যে অঞ্জলির সব কথা মা'র কাছে বলা হ'লো না। যে কথা আজ তার বলা হ'লো না, অঞ্জলির মনে হ'লো সে কথাই ছিলো তার সব চেয়ে প্রয়োজনীয়।

লাবণ্য বুঝলেন যে অঞ্জলির মনের সুতো আজ জট্ পাকিয়ে গেছে।

লাবণ্য বললেন—এ কথাটা ভেবে দেখো, অঞ্জলি, মানুষ পেলে তার লোভ বেড়ে যায়। আজ সুবীর নির্লোভী কিন্তু কাল তাকে প্রলোভন যদি দেখাও, সেও লোভীর মত ব্যবহার করবে। তখন সুবীরকে লোভী বলে আঘাত দিতে পারবেনা। যে লোভী লোভ করে, সে তার নিজের কথাটাই ভাবে।

অঞ্জলি দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌লে—হ্যাঁ, মা, জানি। আমি সুবীরবাবুকে যখন গ্রহণ করবো, তখন সমস্ত মামলা নিষ্পত্তি করেই গ্রহণ করবো।

লাবণ্য বললেন—তুমি বড় হয়েছ, একথা আমার বলা দরকার যে পুরুষ নিষ্ঠার অভাব সইতে পারে না। তাঁরা যখন দাবী করে,

নিজেদের যোগ্যতার প্রশ্ন তাঁরা করে না। তাঁরা জানে তাঁদে দাবী অসম্মানিত হলে, মিথ্যাচরণ হবে মেয়েদের।

অঞ্জলি প্রশ্ন করলে—আমাদের দাবী যদি অসম্মানিত হয়?

লাবণ্য হেসে বললেন—সে তো পুরুষের অধিকার।

অঞ্জলি ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করলে—মা, পুরুষ এতো একচোখো হয় কেন? একি সব পুরুষের মধ্যেই সহানুভূতির এতো অভাব থাকে? সত্যিই কি মা, বিয়ের পর আমাদের শালীনতার পরিসর এতো কম? মেয়েদের বাণী যে পুরুষের গ্রামোফনে বিকল হয়ে যায়, একথা কি তারা বোঝে না?

লাবণ্য বল্লেন—তাকেই তো ওরা বলে পুরুষের ধর্ম্ম।

পুরুষের দরদহীন পৌরুষ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে অঞ্জলি যতই ভাবতে লাগলো তার মন ততই আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হয়ে গেলো।

বাইরে রাস্তা দিয়ে একটা মোটর চলে গেলে হর্ণের শব্দ শুনে অঞ্জলির মনে হলো যেন নীরেনের মোটরের আওয়াজ। মা ও মেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো।

অঞ্জলি

রাবেয়া জানে দরিদ্র হ'য়ে সংসারে যারা এসেছে, তাদের লোভ করবার অধিকার নেই। দারিদ্র্য তার কাছে সবচেয়ে বড় অপরাধ। রাবেয়া অঞ্জলিকে ক্ষমা করতে পারলো না। সুবীরের দারিদ্র্য তার কাছে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। অঞ্জলির দেহকে পোষবার সামর্থ্য যার নেই, সেই পুরুষ কেন দেহের প্রতি লোভ করবে? যে-পুরুষ দারিদ্র্যের চাপে দশজনের সঙ্গে পা' ফেলে চলতে পারে না, সেই অক্ষম পুরুষ সমাজের পরগাছা। রাবেয়ার মতে প্রেম হ'ল সুরকি, বিত্ত হ'ল সিমেণ্ট আর চূণ। সেই সিমেণ্ট্ আর চূণের যেখানে অভাব, সুরকি সেখানে আল্‌গা হ'য়ে থাকে—কোন থাপ থায় না। বিত্তের স্পর্শ না থাকলে প্রেম যেন শুকিয়ে যায়। রাবেয়া ভাবতে পারে না যেখানে অর্থ নেই, সেখানে প্রেম জমে কি করে। অর্থের অনটন থাকলে প্রেমের মার্কেটে "ডিপ্রেশন" লেগেই থাকে, সেখানে "ষ্টেবিলিজেশনের" চেষ্টা বৃথা।

রাবেয়া জানে সুবীরকে অঞ্জলি বিয়ে করলে নীরেনের "অকুপেশন" গেলো। রাবেয়ার সুবিধে ছাড়া অসুবিধে নেই—তবুও রাবেয়ার মনটা ভাল লাগলো না। রাবেয়ার সবচেয়ে বড় ব্যথা লাগলো যে, যে-বস্তু ধনীর সন্তানকে লোভে কম্পমান করে তোলে, দরিদ্রের সন্তান হয়ে সুবীর তাই ভোগ করবে। দারিদ্র্যের এই স্পর্দ্ধা তাকে পীড়া দিলো।

রাবেয়া ভাবলো যে সুবীর "ব্রুট্", অঞ্জলির দুর্ব্বল মুহূর্ত্তকে সে মূলধনে পরিণত করেছে। সুবীরের হীনতা ভেবে সে শিউরে

উঠলো। মনে হ'লো ধনীর সন্তানরা যেন নিষ্কলঙ্ক ও শুভ্র। রাবেয়াও ঢাকা ইউনিভার্সিটি হ'তে বি, এ, পরীক্ষা দিয়েছে। সে বড় লোকের ছেলে ব্যতীত আলাপ করতো না। তার মনে হ'তো গরীবের ছেলে হ'লেই অসভ্য ব্যবহার করবে, সমাজের শিষ্টতা তারা জানবে কি করে। অর্থ যাদের নেই, ভদ্রতা যে তাদের থাকতে পারে, তা রাবেয়া বিশ্বাস করতো না।

রাবেয়া বিজয়কে সঙ্গে করে টিকাটুলীর "রোজগার্ডেনে" বেড়াতে গেলো। বিজয় এম, এ পড়ে, রাবেয়াকে গান শেখায়। বিজয় দেখতে কালো, বড় লোকের ছেলে। তার শ্রী আছে, মনে সাহস আছে। সে অপবাদকে গ্রাহ্য করে না এবং অপবাদ না রটলে বরং দুঃখিত হয়। ইউনিভার্সিটিতে সে সকল মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে, তার ইচ্ছে যে তার নামে একটা কিছু দুর্নাম রটুক। যদি সহপাঠীদের মধ্যে কেউ অভিযোগ করে যে সে অমুক মেয়ের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করেছে, বিজয় চোখ টিপে হাসতো--তার মানে যে তাকে নিয়েই মেয়েরা অস্থির, সে কি করবে। গর্ব্বে সে চঞ্চল হয়ে উঠতো। গান জানে বলে মেয়েদের মহলে তার প্রচুর আদর। বিজয় বোলপুর থেকে রবীন্দ্রনাথের গান শিখে গেছলো, কিন্তু ঢাকায় গিয়ে দেখলো যে তবলা ছাড়া সেখানে গানের আদর হয় না। গানের ভিতর হিন্দুস্থানী ঢং না দিলে সেখানকার সমাজে জমে না। বিজয় রবীন্দ্রনাথের সুর ভেঙ্গে তবলার সংযোগে হিন্দুস্থানী ঢঙে রবীন্দ্রনাথের গান চালাতে আরম্ভ করলো।

প্রচুর সমাদর বিজয় পেলো। রবীন্দ্রনাথের কথা এবং হাল্কা চালের সুরে যে-রূপ ভেসে বেড়াতো, ঢাকার সমাজ সে-রূপে মুগ্ধ হলো। বিজয় তবলার সঙ্গে ভাষার উচ্চারণকে বিকৃত করে গাইতে লাগলো এবং সবাই বলতে লাগলো যে বিজয়ের গানে 'ক্লাসিসিজিম্'ও বজায় রয়েছে এবং "প্যাসন্ প্লে"ও রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত কাওলাতী সর্পদংশনে যে-রূপ গ্রহণ করলো, সে-রূপ সেখানকার শিক্ষিতা মেয়েদের আকৃষ্ট করলো। বিজয় বলে বেড়াতে লাগলো যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অশুদ্ধ মাত্রা তব্লায় বোলে ধরা পড়ে যায়।

রাবেয়া ও বিজয় একটা বেঞ্চে গিয়ে বসলো।

বিজয় বললে—এবার পূজোয় ওয়ারী ক্লাব থিয়েটার করবে। আপনি যদি একখানা "সোলো" গান গা'ন, তাহ'লে আমি বন্দোবস্ত করি।

রাবেয়া হেসে বল্লে—আপনাকে উদার বলতে হ'বে।

বিজয় প্যাট্ প্যাট্ করে তাকিয়ে রইলো।

রাবেয়া বল্লে—আমরা গেলেই যে আপনাদের ক্লাব তচ্ নচ্ হয়ে যাবে। আপনাদের থিয়েটার দেখতে গেলেই এতো কাণ্ড হয়, তার উপর যদি ষ্টেজে নাবি—সে-তো হ'বে বিরাট্ খাণ্ডব দাহন।

বিজয়ের মনে পড়লো গতবার থিয়েটারে ডেপুটী হরেনবাবুর মেয়েকে নিয়ে যে কাণ্ড হয়েছিলো। মেয়েটি থিয়েটার দেখতে এসেছিলো, পুরুষ ভলাণ্টিয়ারের কাছে জল খেতে চেয়েছিলো।

মন খেতে মেয়েটি গেলো কিন্তু বাড়ী ফিরেছিলো ভোর বেলায় যখন পাড়ায় সব কথা রঞ্জিত হয়ে প্রচারিত হয়ে গেছলো।

বিজয় বল্‌লে—এ-তো শুধু একার অপরাধ নয়।

রাবেয়া বল্‌লে—অপরাধের কথা বল্‌চিনে। কিন্তু একটা মেয়ের লোভ তো পুরুষ সাম্‌লাতে পারলোনা।

বিজয়ের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠ্‌লো। সেও তো রাবেয়ার লোভ সাম্‌লাবার চেষ্টা করেনি।

বিজয় সাহস ক'রে বল্‌লে—লোভ সংবরণ করলে মেয়েরা খুসী হয়, একথা তো পুরুষের জানা নেই।

রাবেয়া চট্‌ ক'রে বলে উঠ্‌লো—যে পুরুষকে খেলাতে হয়না, আটক্‌ পড়বার জন্যই ছুটে আসে তার প্রতি একটু পরেই মেয়েদের মন বিস্বাদ হ'য়ে উঠে। আমি তো পুরুষদের কাঙাল-পনায় ব্যথা পাই। পুরুষদের চিরদিন পঙ্গপালের মত ছুটে আস্‌তেই দেখেছি।

বিজয়ের নিজের কথা মনে পড়ল। তবু সে আত্মরক্ষার্থে বললে—প্রেমের ভিক্ষাবৃত্তিকে কাঙালপনা বলা ঠিক হ'বেনা। পুরুষ এতো সহজে ধরা দেয় কারণ তারা মেয়েদের "না" বলে আঘাত দিতে চায় না।

রাবেয়া বল্‌লে—আমাদের তূণের অস্ত্র যে কোন কালেই নিঃশেষ হ'লো না।

এমন সময় নীরেন তার মামাত বোন শীলাকে সঙ্গে করে সেখানে এসে উপস্থিত হ'লো। শীলা লক্ষ্ণৌ মরিস্‌ কলেজে গান

শেখে, ছুটীতে ঢাকায় এসেছে। পড়তে তার ভাল লাগেনা বলে ম্যাট্রিক্ পাশ করে কলেজে যায়নি এবং বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই বলে মিউজিক্ কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। শীলার মতে মিউজিক্ কলেজ থেকে পাশ করলে তার চাকুরীর ভাবনা কর্তে হ'বেনা। এক সময় একটা রব উঠেছিলো যে নীরেন শীলাকে বিয়ে করবে। পাত্রপাত্রীর খুব আপত্তি ছিলোনা কিন্তু ঘোর আপত্তি ছিলো ছুই পরিবারের। এমন সময় অঞ্জলির সঙ্গে নীরেনের পরিচয় হ'লো—শীলা নীরেনের মনে যে আগুন জ্বালিয়েছিলো, তা' ধীরে ধীরে নিস্তেজ হ'য়ে এলো। বাইরের দিক্ থেকে ধরাছোঁওয়া গেলোনা কিন্তু ভিতরে ভিতরে ছুজনেই অনুভব করলো যে সেই উন্মাদনা নেই, নীরেনের মনের ধূম্রায়মান বহ্নি আবার অঞ্জলির ছোঁয়া পেয়ে জ্বলে উঠ্লো।

নীরেনকে দেখে রাবেয়া হাস্লো। এ হাসি "মোনালিসার" রহস্যময়ী হাসি নয়, এ হাসি বৈষ্ণব-সাহিত্যের রসের নাগরীর কামগন্ধহীন হাসি নয়, এ হাসি দেহের যৌবন ও মনের উত্তাপে সংযুক্ত হয়ে "মেগ্নেটিক্" হয়ে উঠেছে। এ হাসিতে পুরুষের যৌবন "শক্" পেলেও আকৃষ্ট হয়।

বিজয় রাবেয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো—তার মনের উত্তাপের টেম্পারেচার বেড়ে গেলো।

নীরেন ও শীলা রাবেয়াকে ক্ষুদ্র নমস্কার জানালো :

রাবেয়া জিজ্ঞাসা করলে—নীরেনবাবুর অঞ্জলির সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

যে খোঁটা ছিল, তা' সুস্পষ্ট—তাই সবাই সেটা বুঝলো।

নীরেন কথায় ও ব্যবহারে অতি ভদ্র—কোথায়ও অসঙ্গতি বা অশোভনতা নেই। নারীদের কাছে সে দুর্ব্বল কিন্তু অভদ্র নয়। তার ব্যবহারে একটা ব্রিটিশ্ ডিসিপ্লিন ছিল—তাই তার লিরিকেল্ মনের দুর্ব্বলতা মেয়েদের কাছে এপিকের সংযম বলে মনে হ'তো।

নীরেন বললে—যাবার পথতো সংকীর্ণ হ'য়ে এসেছে। যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর অঞ্জলি নিজ হাতে রচনা করেছে, তাকে ভাঙতে হ'লে যে পালোয়ানী শক্তির দরকার হ'বে, তা আমি কখ্খনো দেখাবোনা।

শীলা নীরেনের মুখের দিকে তাকালো। সে সব জানতো কিন্তু আজ নীরেনের কথায় চমৎকৃত হ'লো।

রাবেয়ার দীর্ঘনিঃশ্বাসে তার বুক দুলে উঠ্‌লো।

রাবেয়া বললে—যদি ভাঙবার সাহস না থাকে তাহলে শক্তি ধারণ করে ফল কি?

নীরেন ভাবলো যে রাবেয়া চায় প্রেমের রাজপথে শক্তির ঠোকাঠুকি, সে হার-জিৎ দেখে জয়মাল্য দিতে চায়।

নীরেন বল্‌লে—যে-প্রাচীর অঞ্জলি নিজের হাতে রচনা করেছে, তাকে ভেঙে অঞ্জলিকে আঘাত দিতে চাইনে।

রাবেয়া বল্‌লে—এই আঘাত না পেলে যে মেয়েরা নিজেদের চিন্‌তে শেখেনা।

শীলা মনে মনে রাবেয়ার কথাকে অনুমোদন করলো।

নীরেন প্রেমের ঘোড়দৌড়ে নিজেকে খুব্‌ড়ে ফেল্‌তে চাইলো না।

রাবেয়া আরো স্পষ্ট করে বল্‌লে—অঞ্জলির মত মেয়েকে সুবীরবাবু ভোগ করবে—এতে তো আমাদের সমাজের মাত্রা কাটা যাবে। যারা পরের অনুগ্রহে এতো বড় হয়ে উঠেছে, তাদের ভোগে আবার এতো বিলাস কেন? গৃহের বহির্বাটিতে যারা স্থান পেয়ে এলো, প্রেমের অন্তঃপুরের এতো সোহাগ তারা কেন পাবে?

নীরেন হেসে বল্‌লে—বিধাতা পুরুষের "ব্যালান্স" জ্ঞান অদ্ভুত। সুবীর খালি হাতে এসেছে মুঠো ভরে এই পৃথিবীতে পাবে বলে। তার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করতে গেলে পথে ধুলো উড়বে, পথের লোক হাসবে।

শীলা চট্ করে বলে উঠ্‌লো—লোক হাসবে বলে স্বেচ্ছায় সব ছেড়ে দিতে হবে?

রাবেয়া বললে—আপনার দাবী আপনি ছাড়তে পারেন কিন্তু তাই বলে অঞ্জলি সুবীরবাবুর দখলে যাবে, তা'তো হতে পারেনা। আমাদের সমাজের ত্রিসীমানায় আস্‌তে যার বুক কেঁপে উঠতো, আমাদের দাক্ষিণ্যপূর্ণ দৃষ্টি যার স্বপ্নের মত ছিলো, যে আমাদের কাছে সঙ্কোচে কেঁপে উঠবে, দীনতায় লজ্জা পাবে, যে আমাদের নিয়ে স্বপ্নসৌধ রচনা করবে অথচ ছুঁতে পারবেনা, সে কি না হ'বে অঞ্জলির বর! এ-যে আমাদের অপরিসিম লজ্জার কথা।

রাবেয়ার কথা শুনে বিজয়ের মনে হ'লো যে সুবীরের এতো স্পর্দ্ধা ভালো নয়। শীলা মনে করলো, সুবীর নিশ্চয়ই কোন হীন চক্রান্ত করে অঞ্জলিকে হাত করেছে; শুধু নীরেন কিছু ভাবলোনা। সে জানতো যে অঞ্জলি কচি মেয়ে নয়—তাকে পথ ভুলিয়ে দেবার মত শক্তি সুবীরের নেই। অঞ্জলি যেখানে অনিচ্ছুক, পুরুষের পৌরুষ সেখানে অক্ষম।

নীরেন বললে—সুবীর যখন পেয়েছে, তখন বলতে হ'বে যে তার শক্তি আছে।

বিজয় ধীরে ধীরে বললে—হ্যাঁ, শুনেছি যে সুবীর আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে এম, এ তে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছিলো। কংগ্রেসের ছোক্‌রারা ওর মাথা নষ্ট করে দিয়েছে।

রাবেয়া বিরক্তির সুরে বললে—ফার্ষ্ট ক্লাস পেলেই যে মেয়েরা মাথা খুড়ে মরবে, তার কোন মানে নাই। তাদের পেতে হ'লে দারিদ্র্যের খরস্রোত পার হয়ে আস্‌তে হ'বে।

রাবেয়ার কথা নীরেনের ও বিজয়ের মন্দ লাগলোনা। কারণ তাদের ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স উপেক্ষার বস্তু ছিলনা।

শীলার মনে পড়ে গেলো লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকের প্রেমনিবেদন। সেই অধ্যাপকটি অর্থের সাহায্যে শীলাকে পেতে চেষ্টা করেছে—শীলা সেই অধ্যাপকের অর্থকে গ্রহণ করতো কিন্তু প্রেম গ্রহণ করতো না। সেই অধ্যাপকের সুন্দরী স্ত্রী অধ্যাপককে বাধা দিত না—কারণ সে জানত যে তার স্বামীকে বাধা দিলে গণ্ডগোল বাড়বে বৈ কমবে না। সে ভাবতো,

তার স্বামী শীলার দিকে যতটা ঝুঁকবে, তার নিজের স্বাধীনতার পরিসর তত বাড়বে। বিবাহিতা স্ত্রীদের যখন স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের দিকে দৃষ্টি থাকে, তখন তারা এম্‌নি করে নিশ্চিন্তে স্বামীকে পরের হাতে সমর্পণ করে দেয়। এ যেন তাদের দাবাখেলার চাল—রাজাকে কিস্তির মুখে রেখে অন্য বোড়ের চালের স্বাধীনতা বাড়িয়ে নেওয়া। শীলা অধ্যাপকের প্রেম যতই প্রত্যাখ্যান করতো, অধ্যাপক যেন ততই পাগল হ'য়ে উঠতো। প্রত্যাখ্যানে এতো আকর্ষণে বাড়ে, শীলা লক্ষ্ণৌতে গিয়ে সেই সত্য লাভ করেছে। অধ্যাপক বলতো, বিয়ে করবো। শীলা হাসতো। শীলা জানতো, এরা এমন ধরনের লোক যে যতক্ষণ না পাবে, এরা চাইবে, কিন্তু পেলে আর চাইবে না। শীলা বুঝতো, যারা নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে অবহেলা করতে পারে তাদের মন অভিসারের দিকে—মিলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখের রঙ ফিকে হয়ে আসে। তাই শীলা হাসতো, ঝুঁয়ে পড়তো কিন্তু ভাঙতো না। সে নীরেনের কাছে ভেঙে পড়ে দেখেছে যে পুরুষেরা ভাঙা জিনিষের কদর জানেনা।

নীরেন রাবেয়ার দিকে চোখ চেয়ে বললে—আপনি সুধীরকে দোষারোপ কর্চ্ছেন কেন? আমি তো শুনেছি যে অঞ্জলি স্বেচ্ছায় নিজেকে দিয়েছে।

রাবেয়া বললে—অঞ্জলি তো স্বেচ্ছায় নিজেকে আপনাকেও দিয়েছিলো।

নীরেনের চোখের হাসি থেমে গেলো। বিজয় কৌতুক অনুভব করলো।

শীলা এতক্ষণ পরে বললে—মেয়েদের স্বেচ্ছার দানকে অতো বড় করে দেখো না, নীরেনদা; ওরা অতীতকে সহজে ভুলে যায়, ভবিষ্যৎকে সহজে ডুবিয়ে দেয়, আর বর্ত্তমানকে সহজে আঁকড়ে ধরে। ওরা দূরের বস্তুর চেয়ে নিকটের বস্তুর দাম দেয় বেশী। ওদের জীবনে কি শুধু একবার মরণ হয়, ওরা যে হাজার মরণে মরে'ও বেঁচে থাকে। তোমরা ওদের বেঁচে থাকাটাই দেখ, আমরা তো ওদের মরণের ইতিহাসটা জানি।

নীরেন বুঝতে পারলো না যে শীলার বচনে কোন হুল্ আছে কি না। রাবেয়ার কাছে কথাগুলো খুব ভালো লাগলো। বিজয় থত্‌মত খেয়ে গেলো—শীলার নম্র মুখে যে এমনি স্পষ্ট জিহ্বা, বিজয় কিছুই জানতো না।

নীরেন অস্বীকার করতে পারলোনা যে একদিন অঞ্জলি তারই বরণ-সঙ্গীতে ভরপুর ছিল। সেই সঙ্গীতের আজ তাল কেটে গেছে, সঙ্গীতের যতি আর সমে এসে পৌছতে পারলো না।

নীরেন নিজেকে দোষী মনে করে বললে—আমাকে ভালবেসেছিল বলে অঞ্জলি যে আর কাউকে ভালবাসতে পারবে না, এমন তো নয়।

রাবেয়া বললে—ছিঃ নীরেনবাবু, একথা কি পুরুষের সাজে? আপনারা বাঁধন আলগা করেন বলেই তো আমাদের সতর্ক হয়ে

চল্‌তে হয়। আমরা নিঃস্ব হয়ে নিজেদের উজাড় করে ফেলতে পারিনে, আমাদের অবলম্বন রাখতে হয়।

নীরেন ভাবলো, তার মুখে ভীরুতার কথা না সাজুক—অঞ্জলিকে সে ক্ষমা করবেই। অঞ্জলির ভালবাসার দিনগুলো স্মরণ করে সে পুলকে শিউরে উঠ্‌লো। নীরেনের মনে হ'ল যে অঞ্জলি যাকেই বিয়ে করুক, তাকে ভুলতে পারবেনা। নীরেন জানে যে এই স্মরণের স্মৃতিটুকু নিয়েই সে জীবন কাটাতে পারবেনা—তবুও সেই স্মৃতি যে কত মূল্যবান, তা বাইরের রাজপথে প্রচারিত না হোক্, তা' যেন তার অন্তরে মহিমান্বিত হ'য়ে থাকে। এই ক্ষুদ্র সম্বলটুকু জীবনে সে ত্যাগ করতে পারবেনা—তাই অঞ্জলিকে নিয়ে জবরদস্তি করে নীরেন সেই সম্বলটুকু হারাতে রাজী নয়।

নীরেন বললে—মিস্ ডাট্, আজ অঞ্জলির কথা আর নাই তুললেন।

রাবেয়া মুখ বাঁকিয়ে বললে—ইস্, আমাদের মুখে অঞ্জলির নামও সইতে পারেন না।

নীরেন স্পোর্টিংভাবে বল'ল—আপনার কাছে যদি অঞ্জলির কথা মনে না হয়, সে দোষ আর যারই হোক্, অঞ্জলিরও নয় আমারও নয়।

রাবেয়ার চোখ হাসিতে উজ্জ্বল হ'লো, কান লজ্জায় লাল হ'লো। বিজয়ের কাছে কথাটা ভালো লাগলোনা।

লীলা বললে—চলোনা নীরেনদা, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বাড়ী চলো।

নীরেন আদর করে লীলার হাত ধরলো। রাবেয়া ও বিজয় সঙ্গ নিলো। চারজনে কথা বলতে বলতে বাড়ীর দিকে চললো।

পথের মোড়ে মোড়ে কলেজের ছেলেরা জটলা করছিলো। বিজয় তাদের দিকে তাকালোনা, পাছে চেনা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়।

রাবেয়া পাড়ার ছেলেদের লক্ষ্য করে চলে। চলে আর ভাবে, এমনি করেই পুরুষদের শাস্তি দিতে হয়।

ছেলেরা বলাবলি করে—দেখছিস্, রাবেয়া দেবীর অহঙ্কার যেন উপচে পড়ছে। ওই অহঙ্কার একদিন পুরুষের দণ্ডেই দণ্ডিত হবে।

ছেলেরা হো হো করে হেসে ওঠে। রাবেয়া চোখ চেয়ে দেখে। বিজয় নীরেনের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করে।

সরোজ রায়ের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গেলো যে অঞ্জলি সুধীরকেই বিয়ে করবে। অঞ্জলির মামাত ভাই-বোনেরা বিস্ময় প্রকাশ করলো।

আইভি অঞ্জলির মামাত বোন। আইভি একদিন এসে অঞ্জলিকে বললে—তোর যত প্রশংসাই বাজারে থাক্, তোর রুচিকে প্রশংসা করতে পারলেম না। যে সব ছেলেরা কংগ্রেসের 'প্রসেসন্' করে বেড়ায়, কোন মেয়ে তাদের কাউকে বরের আসন দিতে প্রস্তুত, একথা ভাই আমার জানা ছিলনা।

সুধীর ছিল কংগ্রেসের যুবকদলের নেতা। অঞ্জলি আইভির খোঁটাতে কৌতুক অনুভব করলো।

অঞ্জলি বললে—সেদিন তাহ'লে যুব-সম্মেলনে খদ্দর পরে গান গাইতে গিয়েছিলি কেন?

আইভি হেসে উত্তর দিলে—ওদের আবেদন গ্রাহ্য করে ভাই করুণা বিতরণ করা যায়। ওটা ত প্রেমের উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়।

অঞ্জলির ইচ্ছে হ'ল যে বলে, করুণা বেশী বিতরণ করতে গেলেই তার ফিকে রঙ প্রেমের আবীরে লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু সে তা বললেনা। আজ বিরুদ্ধতার দিনে অঞ্জলি পণ করেছে যে সে কাউকে কঠিনভাবে আঘাত করবে না। তার জীবনের মিলনোৎসবে কোন মাত্রা কাটিতে দেবেনা।

অঞ্জলি

অঞ্জলি শুধু হেসে বললে—যখন ধরা পড়েই গেছি, তখন তাকে স্বীকার করে গ্রহণ করাই ভালো।

আইভি চট্ করে বললে—ও তোমার হিঁদুয়ানী রেখে দাও। স্বীকার করা ও গ্রহণ করার বেড়া-জালে আমাদের মেয়েজাতটা পঙ্গু হয়ে উঠেছে। তাদের আজ বুঝিয়ে দিতে হ'বে যে তারা নারী এবং তারপর তারা স্ত্রী।

আইভি ব্রাহ্মসমাজে আনাগোনা করে। তার ধারণা যে হিন্দুসমাজ চলেছে এঁকেবেঁকে—পথ সরু, রাস্তার মোড়ে মোড়ে শাস্ত্রের পচা ডোবা, সেখানে অবগাহন করে আবার সরুপথে চলতে হ'বে। আইভির গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠ্‌তো। তার বিশ্বাস যে ব্রাহ্মসমাজের গতি সরল ও ঋজু, সেখানে দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত, পেছনের দিকে তাকিয়ে সম্মুখে এগুতে হয়না। আইভি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছাত্র সমাজের একজন উদ্যোগী সভ্য। মাঘোৎসবে সে কলেজে যায়না এবং ভাদ্রোৎসবে সে ছাত্রসমাজে প্রবন্ধ পাঠ করে। তার গর্ব্ব যে সে হিন্দুসমাজের মেয়ে অথচ হিন্দুসমাজের পচা ডোবাতে সে স্নান করেনা, সে অবগাহন করে ব্রাহ্মসমাজের মুক্ত সলিলে।

অঞ্জলি কিছু বললেনা। আইভি অঞ্জলিকে বোঝাতে চেষ্টা করলে যে বিয়েটা হ'ল কোঁপরা—সে জীবনের স্বাদকে নষ্ট দেয়। সে ইবসেন্ হ'তে আরম্ভ করে রাসেল্ পর্য্যন্ত অনেকের মত আওড়ালে, অঞ্জলি তার সব মতকে মানলে কিন্তু কোনটা গ্রহণ করলেনা।

আইভি রাগ করে চলে গেলো—অঞ্জলির হিঁদু টেম্পারামেন্টকে বিদ্রূপ করতে ভুললোনা।

আইভির ভাই জ্যোতি। সে একদিন লাবণ্য দেবীর কাছে এসে বললে—পিসিমা, শুনছি অঞ্জলিকে সুবীরের হাতে ফেলে দিচ্ছো।

লাবণ্য বললেন—ছিঃ, ওকথা বলতে নেই—বোনের বিয়ে, তোমরা তো কত আমোদ আহ্লাদ করবে।

জ্যোতি গেণ্ডেরিয়ার নবীনসঙ্ঘের সভ্য। সুবীর ছিল উয়ারীর স্বরাজসঙ্ঘের সভ্য। এই দুইদলে ছিলো ঝগড়া। এবং য কোন অজুহাতে এই দুই সঙ্ঘের "সন্তানরা" মারামারি রতো—তাদের মাথা ফাটতো, হাসপাতালে যেতো, আবার ন্ধি স্থাপন হ'তো।

জ্যোতি বললে—যদি বলো পিসিমা, আমরা এমন ব্যবস্থা রে দিতে পারি যে সুবীর আর ঢাকায় ফিরবেনা। এখনো লছি, অঞ্জলিটাকে জলে ফেলে দিয়োনা। মেয়েটা ছিলো ালো, কিন্তু তোমাদের যে কি বুদ্ধি!—বাপ নেই, মা নেই, । নেই, বাড়ী নেই, এমন একটা ছেলের সঙ্গে তোমাদের য়ে দেবার কি দরকার ছিলো? ওকে পেলে আমি দেখে তেম যে সুবীর কি করে বিয়ে করে?

এই কথাগুলো বলে জ্যোতি বুকের ছাতিটা সগর্বে স্ফীত লো—সে যেন বলতে চায় যে উয়ারীর স্বরাজ সঙ্ঘের দরা তার ইচ্ছায় বাধা দিতে সাহস করবেনা।

লাবণ্য শুধু জিভ্ কেটে বললেন—ছিঃ জ্যোতি, এসব কথা বলতে নেই।

কেন বলতে নেই তা জ্যোতি বুঝলেনা, বুঝতে চাইলেনা, বোঝালেও হয়তো বুঝতে পারতোনা। সে বিরক্তির সঙ্গে চলে গেলো।

অঞ্জলির এক জেঠাই মা ছিলেন, তিনি থাকতেন বিধান-পল্লীতে। তিনি এসে একদিন বললেন—লাবণ্য, শুনছি যার সঙ্গে অঞ্জলির সম্বন্ধ ঠিক্ করেছ, সে রোজগারে ছেলে নয়—কংগ্রেসের গুণ্ডাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। আমাকে বললেও তো পারতে, আমিই না হয় স্থির করে দিতুম। আমার ভাইপোরাও তো ছিলো। ছিঃ, শেষকালে অঞ্জলির কপালে এই ছিলো!

লাবণ্য অসন্তুষ্টা হ'লেন, কিন্তু মুখে হাসি টেনে বললেন—আমরা তো ভাল বলেই জানি।

এমনি ভাবে অঞ্জলির বিবাহ সম্বন্ধে তার আত্মীয়দের ভিতর কাণাঘুষা চলতে আরম্ভ করলো। অঞ্জলি এখন জানতে পারলো যে তার আত্মীয়দের ভিতর তার বিবাহের জন্ম কতটা উৎকণ্ঠা ছিলো। উৎকণ্ঠায় কোন অপরাধ ছিলোনা, কিন্তু উৎকণ্ঠা প্রকাশের ভঙ্গীমা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিষিয়ে তুললো। কেউ কেউ এমন কথাও ইঙ্গিত করলো যে অঞ্জলি ও সুবীরের মধ্যে যে চলাচলি, তাতে যে এমনি একটা কিছু ঘটবে, তা' তারা জানতেন, কিন্তু জেনেও কেন যে তাঁরা কোন সাবধানী বাণী উচ্চারণ

করেননি, সে রহস্য যাঁরা জানেন, তারা বিস্মিত হন না কিন্তু যাঁরা জানেন্ না তারা মনের বেদনায় অবশ হ'য়ে পড়েন। অঞ্জলির বাবার ও মা'র মন শঙ্কায় ভরে উঠ্‌লো, শুধু একমাত্র মেয়ে অঞ্জলির মুখ চেয়ে সমস্ত শঙ্কাকে দু'হাতে দূরে সরিয়ে শুভদিনের অপেক্ষায় রইলেন। অঞ্জলি ঘরে ও বাইরে বিদ্রূপের পিচ্‌কারীতে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। বাইরে শত্রুতার ফেণা যতই ছাপিয়ে উঠ্‌তে লাগলো, অঞ্জলি যেন ততই নিজেকে, নিজের রুচিকে, নিজের অভিলাষকে আঁকড়ে ধরলো। বাইরে থেকে যতই তাড়া আস্‌তে লাগলো, ভিতরের নিষ্ঠা তার ততই বাড়তে আরম্ভ করলো। যেটুকুন দ্বিধা তার ছিলো, শত্রুতার ঢেউয়ে সেই দ্বিধা কেটে গেলো, সে আরও দৃঢ় হ'লো। লুণ্ঠনকারীর হাত হ'তে বাঁচতে হ'লে দাতাও কৃপণতার সঙ্গে সম্পত্তি রক্ষা করে কিন্তু যথার্থ প্রার্থী হ'লে সেই দাতা অকুণ্ঠভাবে বিতরণ করে দেয়। অঞ্জলিও লুণ্ঠনকারীদের হাত হ'তে রক্ষা পাবার জন্য নিজের দেহ ও মনকে কৃপণের মত রক্ষা করতে লাগলো এবং সেই সুরক্ষিত দেহ ও মন সুবীরের জন্য উৎসর্গ করে দিলো।

সুবীর বেচারা বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেলো। সে অঞ্জলির ইচ্ছা জানতে পারলো এবং অঞ্জলির আত্মীয়দের বিরুদ্ধতার সঙ্গে ও তার পরিচয় ঘটলো। সুবীর প্রথমটা ভাবলো যে সে অঞ্জলিকে বুঝিয়ে বলবে—যে সে যেন তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত না হয়। সুবীরের সে সুযোগ ঘটলোনা। অঞ্জলি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে বসে রইলো, আত্মীয়দের বিরুদ্ধতা তাকে টলাতে পারলো না।

সুবীর অঞ্জলিদের বাড়ীতেই থাকে—সে কংগ্রেসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তার তখন ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করবার সময় নেই। সুবীর কখনও কল্পনা করেনি যে সে অঞ্জলিকে বিয়ে করবে, তার মনে এতটা বিলাস ছিলোনা। কিন্তু যখন সমস্ত ঢাকার সহরে সমস্ত ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়লো অতিরঞ্জিত হয়ে, তখন সুবীরের বিস্ময়ের সীমা ছিলোনা। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে ও একটা পুলকের স্পন্দন দিলো, তার দাবীর ঔদ্ধত্যে অঞ্জলিকে সে কখনোও পীড়া দিতে পারতোনা, কিন্তু অঞ্জলি যখন স্বেচ্ছায় অযাচিতভাবে তীর্থযাত্রীর সমস্ত নিষ্ঠা ও সংযম নিয়ে তার হৃদয় মন্দিরের দ্বারে এসে উপস্থিত, তখন মন্দিরের অর্গল রুদ্ধ রাখতে সুবীরের সাহস হ'লোনা—ইচ্ছেও হ'লোনা। সুবীর জানতো যে অঞ্জলিদেবীর হৃদয়মন্দির পর্য্যন্ত পৌছুতে হ'লে অনেক পাণ্ডার অত্যাচার সইতে হ'বে—সে কখনো সেই চেষ্টা করেনি—বরঞ্চ আশ্রয়দাতার কন্যা অঞ্জলিকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখে এসেছে। সেই শ্রদ্ধা আজ অঞ্জলির অনুগ্রহের উত্তাপে গলে গলে প্রেমের রূপ নেবার চেষ্টা করছে। এই রূপান্তরের জন্ম সুবীর দায়ী ছিলোনা। কিন্তু দায়িত্ব যারই থাক, এই রূপান্তরিত অবস্থা অচপল সুবীরকে একটু চপল ক'রে তুললো। বন্ধুদের যুগপৎ খোঁটা ও অভিনন্দন তার মনের রাজ্যে একটি স্বপ্ন-লোক সৃষ্টি করে তুললো; সুবীরের আজ মনে হ'লো যে মনের মধ্যে একটি অনাবিষ্কৃত নিভৃত কক্ষ ছিলো, অঞ্জলি যেন সেই কক্ষের চাবির সন্ধান দিয়ে দিয়েছে। সুবীর জানতো না যে

তার সেই হৃদয়-কক্ষের চাবি অঞ্জলির আঁচলে। সংযমী সুবীরের সেই আঁচলের দিকে লোলুপ দৃষ্টি পড়লো।

সুবীর যে অঞ্জলির ঢেউয়ে উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে, তা' নয়—কিন্তু তার মনের স্রোতস্বিনীতে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে এবং বান ডেকেছে। যে স্রোতস্বিনী শুকিয়ে আসছিলো, সেখানে বান ডাকলে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, সুবীরের মনেও সেই মর্মরধ্বনিই উঠেছিলো। সুবীরের নতুন সাধ হ'লো যে তার মনের সেই মর্মরবাণী অঞ্জলির পায়ে লুটিয়ে পড়ুক—সকাতরে এবং অতি সাবধানে। সুবীরের স্বভাবে ভীরুতা ছিলো, কৃপণতা ছিলোনা।

সরোজবাবুর পড়বার ঘর অঞ্জলি গোছগাছ করছিলো, এমনি সময় সুবীর ঘরে এসে বললে—আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

এই ভাবে উপরের পড়বার ঘরে আসা সুবীরের স্বভাব নয়।

অঞ্জলি বললে—শুধু একটা কথা বলবার জন্তই একেবারে উপরে এসে হাজির হয়েছেন।

সুবীর তিরস্কৃত বোধ করলো, কিন্তু আজ তার কথা বলতেই হ'বে, তাই কথার হেঁয়ালী ধরবার চেষ্টা করলোনা।

সুবীর একখানা চৌকি টেনে বসে বললে—আপনি না-কি পণ করেছেন যে আর কাউকে বিয়ে করবেন না।

অঞ্জলির বুক কেঁপে উঠ্‌লো।

সুধীর বলে যেতে লাগলো—আপনাদের অনুগ্রহ অযাচিত-ভাবে পেয়েছি। কিন্তু বিয়ের ব্যাপার তো অনুগ্রহের ব্যাপার নয়।

অঞ্জলি চোখ চেয়ে বললে—অনুগ্রহ করে যে মেয়েরা কাউকে বিয়ে করতে পারে না, সে কথাও আপনার জানা উচিত, সুধীরবাবু।

যে কথা তার জানা উচিত, সুধীর সে কথা জানতো। সে শুধু জানতে এসেছিলো যে অঞ্জলি শুধু অনুগ্রহের বশবর্ত্তী হয়ে তাকে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছে কি-না। অনুগ্রহের ভার সে আর সইতে পারবেনা, এই কথাটাই সুধীরের হৃদয়-কন্দরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।

সুধীর বললে—আমি আপনার বাবার কাছে এতটা অনুগ্রহ পেয়েছি, যে আপনার কাছে হাত পাততে আমার ক্লেশ হয়। বরাবর হাত পেতেই নিয়ে এসেছি, তবুও আজ আমার হাত পাততে এতো কুণ্ঠা, এতো সঙ্কোচ! জানেন, ভিক্ষার ভাণ্ড ভরে গেলে ভিক্ষুকেরও ভিক্ষা প্রার্থনায় সঙ্কোচ আসে। আশা করি, আমাকে ভুল বুঝবেন না।

অঞ্জলি সহজভাবে বললে—আপনি আমার কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন, একথা ভেবে আমাকে পীড়া দেবেন না। এ-তো আর আমার জীবনের কাঙালী উৎসব নয় যে করুণা বিতরণ করে আমি পরকে ধন্য করবো। এ-যে আমার জীবনের মহোৎসব—এ-যে দান করে আমি নিজেকে কৃতার্থ করবো।

অঞ্জলি আজ ভুলে গিয়েছে যে একদিন নিতান্ত করুণার বশবর্ত্তী হ'য়েই সে সুবীরকে ঘিরে বিকশিত হ'বার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু অঞ্জলি জানতে পারেনি যে এই নারীসুলভ করুণা বিগলিত হয়ে আজ প্রেমের মালা রচিত করেছে। আজ এই মালা পড়তে গেলে বাঁধে, কিন্তু ছাড়তে গেলে ব্যাথা লাগে। এই বাধা ও দ্বিধাকে অতিক্রম করে নিজেকে জয়মালায় শোভিত করে তোলাই তার প্রধান কাজ।

সুবীর আশস্ত হয়ে বললে—আপনি খামকা চতুর্দ্দিকের বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়াই করছেন কেন?

অঞ্জলি ভ্রূ কুঁচকে বললে—আপনি যাকে খামকা বলছেন, হয়তো আমার কাছে তার দাম আছে।

সুবীর বললে—কিন্তু সেই দাম দিতে গিয়ে আমাকে অপরাধী করে তুললেন।

অঞ্জলি বললে—সেই অপরাধের ভার সইতে পারবেন না?

কথাটা বলে অঞ্জলি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

সুবীর খোঁটাতে বিবর্ণ হয়ে গেলো। সত্যিই তো, সে কি অঞ্জলির জন্য অপরাধের আঁচড় সইতে পারবে না? আজ সুবীরের মনে হলো সে যেন অঞ্জলির জন্য অপরাধের পাহাড়ের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারলে বাঁচে। এ কথা কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হোক্ যে সুবীর অঞ্জলির প্রেমে অপরাধী, জগতের বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হোক্। আজ নিজেকে দোষী মনে করে আরামের নিঃশ্বাস ফেলে সুবীর ঘর হ'তে ধীরে ধীরে চলে গেলো।

অঞ্জলি

অঞ্জলির কাজ থেমে গেলো। সিঁড়ি দিয়ে নামবার শব্দ অঞ্জলির বুকে কাঁপন এনে দিলো। সুবীর যতক্ষণ ছিলো, অঞ্জলি ছিলো ধীর ও স্থির। সুবীর যখন চলে গেলো, অঞ্জলির সর্ব্বশরীর কাঁপতে লাগলো।

হাতের কাছে রবীন্দ্রনাথের "বলাকা" সে বৃথাই পড়তে চেষ্টা করলো।

এমনি ভাবেই কিছুদিন কাটলো। অঞ্জলির বাবা ও মা আত্মীয়দের খোঁটা ও পরিজনদের বিদ্রূপের মধ্যে অঞ্জলির বিবাহের আয়োজন করতে আরম্ভ করলেন।

২৫শে বৈশাখ অঞ্জলির বিয়ে। বিয়ের পর অঞ্জলির স্থান পরিবর্ত্তনের কোন আশঙ্কা রইলো না—শুধু সুধীর বাইরের ঘর থেকে ভিতরের ঘরে স্থান পাবে। বিয়ের পরে অঞ্জলিকে ছাড়তে হবে না, এই চিন্তা লাবণ্য দেবীকে খুব তৃপ্তি দিলো।

অঞ্জলি খুব ব্যস্ত। তার বন্ধুদের সে নিজে গিয়েই নিমন্ত্রণ করচে। তাই তার এতোটুকু সময় নেই। সুধীরের এ সব বালাই নেই, সে ভাবে তার তো কাউকে নিমন্ত্রণ করার অধিকার নেই। সে চুপ্‌চাপ্‌ ঘরে বসে সময় কাটায়। ক্ষণে ক্ষণে তার মনে জাগে—সে যা করচে, তা অন্যায় করচে কি না—কারোর প্রতি অবিচার করচে কি না। বিয়ে সে করতে যাচ্ছে কিন্তু বিয়ে করবার মন তার কোনো দিন ছিলো না। অঞ্জলিকে আজ সে পেতে বসেছে, কিন্তু অঞ্জলিকে পাবার দুঃসাহস সে মনে কোন দিন কল্পনা করেনি, এ সব ঘটলো কিন্তু এ সব ঘটনার উপর তার কোন হাত নেই। সুধীরের কাছে এটাই পরম বিস্ময়ের বলে বোধ হলো, যে এতদিন পৃথিবীতে বঞ্চিত হয়ে এসেছে, আজ করুণার ধারা অযাচিতভাবে তার কাছে কি করে এসে পৌঁছলো, সুধীর এই রহস্যের কোন থই পেলো না। সুধীর

যতই ভাবতে লাগলো, রহস্যের আঁধার ততই ঘন হয়ে এলো। অথচ ভাবার শেষ নেই এবং রহস্যের অন্ধকারে সে আলোর পথ খুঁজতে লাগলো। কর্মী সুধীর নিশ্চেষ্টভাবে দিন কাটাতে লাগলো।

অঞ্জলি রাবেয়াকে সঙ্গে নিয়ে নিমন্ত্রণে বেরিয়ে গেলো। অঞ্জলি প্রথম পাড়ার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ চিঠি দিলো—তার মুখ চোখে তৃপ্তির হাসি। হুল্ ফোটাবার চেষ্টা যে অঞ্জলির কোন বন্ধুর ছিলো না—এমন নয় কিন্তু অঞ্জলির সরল হাসির চাপে হুলের বদলে সবার মধু বেরিয়ে এলো। হাসিতে হাসিতে অঞ্জলির নিটোল অবয়ব দুলে উঠলো—তাতে কেউ বাধা দিতে সাহস করলো না।

অঞ্জলি তারপর তার মামার বাড়ী গেলো—মামাত বোনেদের নিজে নিমন্ত্রণ করবে। আইভি অঞ্জলি ও রাবেয়াকে দেখে একটু মৃদু হাসি হাসলে। অঞ্জলি বিয়ের নিমন্ত্রণ চিঠি দিয়ে সংবাদটা বললো।

আইভি অপাঙ্গ দৃষ্টিতে একবার অঞ্জলিকে দেখে নিয়ে বললে—এ তো বিয়ে নয়, এ যে তোর ফাঁসীর হুকুম।

অঞ্জলি হেসে বললে—আজকের দিনে একথা বলতে নেই।

আইভি বললে—বিয়েকে তোদের মত বড় করে দেখতে পারিনি—দেখতে পারবোও না। তোদের দেখলে মনে হয় যে মেয়েরা নিজের চেয়ে পরকে বিশ্বাস করে বেশী। তা না

হ'লে এমনি করে নিজেকে পরের হাতে তুলে দিয়ে মেয়েরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কি করে।

অঞ্জলি হেসে আইভিকে আদর করে বললে—পরের বোঝা টেনে যে সুখ অনেক—তাতে দায়িত্ব নেই, অথচ প্রেমের আনন্দ আছে। পর যখন আপন হয় ভাই, তখন সে যে নিজের চেয়েও আপন হয়—একথা যেন তোর জীবনে সত্য হয়ে দেখা দেয়।

আইভি বললে—না ভাই, সেই আশীর্ব্বাদ করো না। মন যাদের দুর্ব্বল, তারা আশ্রয় খুঁজে বেড়ায়। পরের বোঝা আমি বইতে পারবো না। জীবনে এই চেষ্টাই করে এসেছি যে নিজের বোঝা বইবার মত যেন শক্তি অর্জ্জন করতে পারি। আমি নিজের শক্তিকে বিশ্বাস করি, আমি মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখরতা নিয়ে জ্বলে উঠতে চাই।

অঞ্জলি বললে—কিন্তু তারও তো পরিণতি অস্তগোধূলীর মিলন স্নিগ্ধতায়।

আইভি চট্ করে বললে—সে হ'বে আমার অবসান। আমি আমার মধ্যাহ্ন গগনের জ্যোতিকে ম্লান করতে দেবো না।

অঞ্জলি বললে—মধ্যাহ্ন গগনে মেঘের মাদল যদি বেজে ওঠে, তাতে জ্যোতির ম্লানিমা আসবে না—মর্ত্ত্যলোকে সেই প্রখর জ্যোতি স্নিগ্ধ হয়ে দেখা দেবে। তাতে উত্তাপ থাকবে না, থাকবে সুশীতল ছায়া। মেঘ ও রৌদ্রের খেলা মর্ত্ত্যলোকে আনন্দ বিকীরণ করবে।

আইভি ভ্রূকুঁচকে বললে—কিন্তু সেই মেঘ কালো হয়ে যদি

সমস্ত আকাশকে ছেয়ে ফেলে। আমার ভয়তো সেই দুর্যোগকে।

অঞ্জলি বললে—তাহ'লে বোঝবে তোমার জীবনাকাশে বসন্ত ফুরিয়ে গে[illegible]কাল বৈশাখীর রুদ্র ঝড় তোমার সইতে হ'বেই।

রাবেয়া আগাগোড়া চুপ করে ছিলো। বিবাহ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মতামত তার এখনো গড়ে উঠেনি। আইভির সমস্ত কথাই রাবেয়া মানতে পারতো কিন্তু পুরুষকে বাদ দিয়ে চলার সার্থকতা সে বোঝতে পারলো না। পুরুষের বোঝা সে কখ্খনো বইবে না—তাদের আবদারে সে চলবে না, এ কথা ঠিক্। কিন্তু তার বোঝা পুরুষ যদি বইতে রাজি হয়, তাহলে বিবাহে যে খুব তার আপত্তি আছে, তা নয়।

রাবেয়া জানে যে তার দেহের রসভাণ্ডে অনেক পুরুষ আটক্ পড়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে প্রস্তুত, সে জানে [illegible] নিজেদের শক্তির সন্ধান রাখলে পুরুষের চাপে তাদের [illegible] হবার আশঙ্কা নেই। যদি সেই আশঙ্কা না-ই থাকে, তাহলে বিবাহের বিরুদ্ধে আইভির অভিযোগ সে মানতে পারলো না।

অঞ্জলি ও রাবেয়া বিদায় নিয়ে বিজয়ের বাসায় গেলো। বিজয় বাসায় ছিলোনা, তাই বিজয়ের বোন মনীষার কাছে সংবাদ দিয়ে তারা অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করতে গেলো। পথে বিজয়ের সঙ্গে দেখা হ'লো। বিজয় বাড়ী না-থাকার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করলো এবং অনুশোচনার নিদর্শন স্বরূপ বিজয় তাদের

সঙ্গ দিতে রাজী হ'লো। রাবেয়া খুশী হ'লো—অঞ্জলি আপত্তি করলো না। বিজয় নিজেকে ধন্য মনে করলো, বিজয় ভাবলো যে অঞ্জলি ও রাবেয়ার সঙ্গে তাকে যদি কলেজের কোন সহপাঠী দেখে, তাহ'লে সে বোঝবে যে বিজয়ের মেয়েদের মধ্যে কি রকম খাতির। বিজয়ের জীবনে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় গর্ব্ব যে বিজয়কে মেয়েরা কি রকম প্রীতির চোখে দেখে। এই বিত্তের ওপর তার কলেজের যশ ও সমাদর প্রতিষ্ঠিত।

সমস্ত বন্ধুদের বাড়ী ঘুরে' ঘুরে' ক্লান্ত অবস্থায় অঞ্জলি, রাবেয়া ও বিজয় নীরেনের হাটখোলার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হ'লো। নীরেনের কাছে বিজয় চুপ্‌চাপ্ থাকে, বিজয় জানে যে-মন্দিরে নীরেন পুরোহিত, সেখানে পাণ্ডাগিরি করে লাভ নেই। যে-মন্দিরে দেবতা জাগ্রত, সেখানে পাণ্ডাদের শ্রদ্ধা নেই—দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা যেখানে নেই, পাণ্ডার কলরব সেখানে বেশী।

নীরেন তখন বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে সাম্‌নের বাগানের দিকে তাকিয়ে ছিলো। সন্ধ্যার ঘোর তখনও সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করেনি। নীরেন ভাবছিলো যে মানুষের সঙ্গীহীন জীবন কি রকম অসাড়; মানুষের চেষ্টা তখনই সার্থক, মানুষ তখনই জয়ী, যখন সে জীবনের সর্ব্ববিধ ক্ষুধাকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছে। নীরেনের মনে হ'লো জীবনে সে অকৃতকার্য্য—তার এমন কোন সম্বল নেই যে সে জীবনের বুভুক্ষাকে নিবারণ করতে পারে। ধনীর সন্তান—অথচ নির্ধনের সমস্ত দীনতা নিয়ে আজ সে

রাজপথে ; বাইরের আবরণ দিয়ে লোককে ভুলানো যায়—কিন্তু নিজেকে ?

এমনি সময় অঞ্জলি এসে বললে—আপনাকে আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

নীরেন দেখলো যে অঞ্জলি রাবেয়া ও বিজয় এসে উপস্থিত হয়েছে। নীরেন সবাইকে বসতে বললো।

অঞ্জলি বললে—আমার বিয়ের দিনে আপনার উপস্থিতি যে বিশেষ প্রয়োজন, একথা বোধ হয় আর বলে দিতে হ'বে না।

একথার উত্তরে নীরেনের হয়তো অনেক কথা বলার ছিলো—কিন্তু বলা হ'লোনা। নীরেন প্রতিশ্রুতি জানালো যে তার উপস্থিতির কোন অন্যথা হ'বে না।

রাবেয়া মুচ্‌কি হেসে বললে—প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠার উৎসব শেষ হ'তে না হ'তেই বিসর্জ্জনের পালা সুরু হয়, কি বলেন নীরেনবাবু ?

নীরেন সহজ ভাবে বললে—বিসর্জ্জনের সময়ও তো উৎসব করার বিধি আছে।

রাবেয়া নীরেনকে খোঁটা দিয়ে বললে—যত উৎসবই করুন, বিদায়ের সুর কখনো আনন্দের কোমলনিখাদে বাজে না।

নীরেন রাবেয়ার কথার সত্যতা স্বীকার করলো।

নীরেন চোখ চেয়ে বললে—বিদায় যত করুণই হোক্, উৎসবের দিনে যা সঞ্চয় করেছি, তা'তো মিথ্যে নয়, তা'তো কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা। সেই শুভ্রদিনগুলি যে পূজার পবিত্রতায় সিক্ত

করে নিয়েছি, তা'তে তো কোন মলিনতা নেই। বিদায়-বিধুর দিনে সেই সঞ্চিত বিত্ত দিয়ে নতুন তাজমহল সৃষ্টি করা যায়। পূজারী প্রাণহীন প্রতিমাকে হাসিমুখে বিসর্জ্জন দেয় কারণ তার নিজের প্রাণে সে প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

অঞ্জলি কথার ঢেউকে বাধা দিয়ে বললে—আপনারা উৎসব করে দেবীকে বিদায় দেন বটে কিন্তু দেবী তাঁর প্রকৃত পূজারীকে ভুলতে পারেন না। দেবীর করুণাধারা কখনো শেষ হয় না।

নীরেন অঞ্জলির দিকে চোখ চেয়ে একবার তাকালো। অঞ্জলির সেই সুস্পষ্ট বলার ভঙ্গী, অকৃত্রিম কণ্ঠস্বর, সপ্রতিভ ব্যবহার, কুণ্ঠা-হীন বাণী নীরেনকে স্তব্ধ করলো। মনে হ'লো দেবী যেন আশীর্ব্বাদের ভাণ্ড নিয়ে তারই দ্বারে উপস্থিত—তার কাছে যাচ্ঞা করা চলে, ভিক্ষা করা চলে কিন্তু দাবী করা চলে না। মুহূর্ত্তের মধ্যে নীরেনের মনে হ'ল যে অঞ্জলি যেন কোন গ্রহ হ'তে কক্ষচ্যুত হয়ে নীহারিকার পথ অতিক্রম করে ইউরেনাস ডিঙ্গিয়ে মঙ্গলগ্রহ পার হ'য়ে তার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে—সেই রহস্যালোকের আলো তারই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হ'য়ে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি বিস্তার করেছে। নীরেনের মুখ দিয়ে শব্দহীন প্রার্থনার বাণী উচ্চারিত হ'লো।

রাবেয়া স্তব্ধতার তাল কেটে দিয়ে বললে—মন যার রক্ত-মাংসের, সেলুলয়েডের নয়, অনুকম্পায় তারা তৃপ্ত হ'তে পারে না।

নীরেন রাবেয়ার কথাটা লক্ষ্য না করে অঞ্জলিকে বললে—আপনার বিয়ের নিমন্ত্রণ আমি সাদরে রক্ষা করবো।

অঞ্জলি মৃদুহেসে ধন্যবাদ জানালো।

অঞ্জলি ও রাবেয়া বিদায় নিলো—বিজয় তাদেরকে অনুসরণ করলো।

অঞ্জলির সমস্ত শরীর তখন কাঁপছিলো—তার চোখের দৃষ্টি কেমন ঘোলাটে হ'য়ে এলো।

রাবেয়া পথে ঠাট্টা করে অঞ্জলিকে বললো—আচ্ছা, আজ তোর মনে কোন অনুতাপ নেই। নীরেনবাবুর জন্য এতোটুকু দয়া হয় না।

অঞ্জলির যে কথা বলতে ইচ্ছে হ'লো সে-কথা সে বললোনা। সে শুধু বললো—রাবেয়া, এই কি আমার অনুশোচনার দিন।

রাবেয়া লজ্জিত হ'লো। লোভী রাবেয়া জানেনা যে লোভকে জয় করেও তৃপ্তি পাওয়া যায়। জীবনে ত্যাগ করেও যে সঞ্চয় করা যায়, রাবেয়া সে-সত্যে বিশ্বাস করেনা—অথবা বিশ্বাস করার মত সম্পদ্ নেই। রাবেয়া জানে যে যাকে হারানো যায়, তাকে পাওয়া যায় না এবং যাকে পেতে হ'বে, তাকে ছেড়ে দিতে নেই। রাবেয়ার প্রণয়কাণ্ডে অভিমানের পালা নেই; যারা প্রণয়ের মোটরকে অভিমানের পেট্রোল দিয়ে চালাতে চায়, রাবেয়া তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। জীবনসুরের কোমলনিখাদে তার বিশ্বাস নেই—অন্তরার পর্দা যত চড়িয়ে দেওয়া যায়, রাবেয়ার আপত্তি নেই। তাই বিজয় তার বন্ধু, নীরেনের দিকে তার নেকনজর, এবং বাইরের দিকে তার টান্।

আত্মীয়-স্বজনের অস্ফুট কাণাকাণির ভিতরে অঞ্জলির বিবাহ হয়ে গেল। সুবীর ঘটনার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছিলো না —তাই সে অভিভূত হয়ে গেল। সরোজবাবু ও লাবণ্য দেবী নিশ্চিন্ত হলেন।

বিবাহের কিছু দিন পরে পরিজনবর্গের কলরব থামলো—কিন্তু থামলো না অঞ্জলির ও সুবীরের বিরহ-বিধুর অন্তরের মিলন-কাতর বেদনা; শান্ত ও ধীর অঞ্জলি মিলনের স্পর্শে চঞ্চল হয়ে উঠলো, "সিরিয়াস" সুবীর "লিরিকেল" হয়ে গেলো। সে বাইরে বেড়াতে যায়, তার থাকতে ইচ্ছা করে না—বাড়ীর ভিতরে আসে, মন কাঁপতে থাকে; সে লোকের সঙ্গে কথা বলে, অথচ কোন কথা মনে থাকে না। অঞ্জলির সামনে কোন কথা মনে আসে না—শুধু অঞ্জলির কথা মনে পড়ে। কর্ম্মী সুবীরের কাছে তার ব্যবহার লজ্জার বস্তু বলে মনে হতো, অথচ লজ্জার হাত এড়িয়ে যাবার তার শক্তি নেই।

অঞ্জলি এসে বললে—আজ লক্ষ্মীবাজারে মণিকাদের বাড়ী যেতে হবে মনে আছে?

সুবীরের মনে ছিলো না—অঞ্জলির কথা শুনে মনে পড়লো যে, মনিকা রায় এসে চায়ের নিমন্ত্রণ করে গেছে।

অঞ্জলি স্বামী ছাড়া এখন কোথাও যায় না। অঞ্জলিকে পেতে হলে দু'জনকেই নিমন্ত্রণ করতে হ'বে। অঞ্জলির বান্ধবীরা

অঞ্জলি-যুগলকেই নিমন্ত্রণ করে—সুবীর মুস্কিলে পড়ে, অঞ্জলি খুসী হয়।

অঞ্জলি ও সুবীর যখন মণিকাদের বাড়ী এসে উপস্থিত হ'লো, তখন সেখানে মেয়েদের হাসির রোল্ চল্‌ছিলো। অঞ্জলি ও সুবীরকে দেখে মণিকা এগিয়ে এসে তাদেরকে অভ্যর্থনা করে বসালো। মেয়েরা, অর্থাৎ অঞ্জলির বান্ধবীরা সুবীরকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো ; তাদের স্তুপীকৃত চাউনীর চাপে সুবীর আরও ছোট হয়ে গেলো।

তারপর চা খাওয়া চল্‌লো—চা খাওয়ার পর গানের হর্‌রা চললো। চা-কাপের ঠুন্‌ঠুনিতে, মেয়েদের হাসিতে, কিণাঙ্কের শব্দে, চলা-ফেরার ছন্দে, শিথিলকবরীর সুগন্ধে, সেদিনকার অপরাহ্ণবেলা সুমধুর হ'য়ে উঠলো। সুবীর সেখানে অপরিচিত অতিথি—তার মনে হ'লো সেখানে সে জোর করে এসেছে, তার কোন দাবী নেই। সুবীরের মনে হ'লো যে জীবনে হাসি-খেলার, রঙ্গ-তামাসার এতেখানি পরিসর আছে, সে যেন তা' জানতো না। জীবন তার কাছে কঠিন কর্তব্যের স্থান—সেই জীবনের প্রস্রবণ হ'তে এতো আনন্দের ধারা বিগলিত হয়ে কঠিন অনুর্ব্বর সৈকতভূমিকে কোমল ও উর্ব্বর করে দিতে পারে, সুবীরের তা' জানা ছিলোনা। সেই সঙ্গীত-মুখর আনন্দের মুহূর্ত্তগুলি সুবীরের চোখের সামনে ছায়া ছবির পর্দ্দার মত সরে যেতে লাগলো, সেই কঙ্কণধ্বনি ও তরল হাসি তাকে তীব্রমদের মত আকর্ষণ করতে লাগলো—তা'র মনে হ'তে

লাগলো তার স্বাদহীন জীবনকে এই উপচে-পড়া আনন্দের বেলার মধ্যে সিক্তিত করে নিতে হ'বে। কিন্তু তবুও সে যেন আরও কঠিন হ'য়ে বসে রইলো—নিজেকে ধিক্কার দিলো, কিন্তু নিজেকে সেখানে আল্‌গা করে মনকে হাল্‌কা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতে পারলোনা।

কিন্তু অঞ্জলি সেই আনন্দের সুরে নিজের সুর সংযুক্ত করে দিলো; যে হাওয়ায় সুবীরের শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌তে লাগলো, সেই হাওয়ায় অঞ্জলির মন হাল্‌কা হ'য়ে এলো।

মণিকা প্রস্তাব করলো—অঞ্জলির গানের সঙ্গে আমাদের উমার নাচ্‌ হোক্‌।

সবাই সমস্বরে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলো। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে অঞ্জলির প্রসিদ্ধি ছিলো, তাই অঞ্জলিকে গানের ভার নিতে হ'লো। উমা প্রথমটা একটু আপত্তি জানিয়ে তারপর নাচ্‌তে রাজী হ'লো।

অঞ্জলি শারদোৎসবের একটি গান ধরলো—উমা তার নিটোল অবয়বের অনুপম ভঙ্গীতে সেই গানকে ব্যাখ্যা করে চললো। দেহের লীলায়িত ভঙ্গীমায় সঙ্গীত এক অপূর্ব্ব রস সৃষ্টি করলো।

সুবীরের প্রাণের সবগুলো তার একসঙ্গে ঝিন্‌ঝিন্‌ করে উঠ্‌লো। জীবনে এতো রূপ আছে, এতো রস আছে—এসব সুবীর কিছুই জানতো না। তার মনে হ'লো জীবনের সুধাভাণ্ডে যার এতো রস আছে, সে-ই ধন্য। মিথ্যা সে এতদিন এই রূপও

রসকে নিন্দার চোখে দেখে এসেছে। যারা জীবনকে এই ভাবে আনন্দরূপে গ্রহণ করতে না পারলো, তারা এই ধরিত্রীর রূপ ও রসের সন্ধান পেলোনা। সুবীরের মনে হ'লো—সে এতদিন নিষ্ফল ভাবেই জীবন কাটিয়েছে, জীবনের আনন্দ প্রস্রবণকে কর্ত্তব্যের কঠিন শিলাখণ্ড দিয়ে বন্ধ করে রূপ ও রসকে শুকিয়ে দিয়েছে। জীবনকে স্বাদহীন করে মিথ্যা গর্ব্বে সে এতোদিন চলে আসছিলো। আজ মনে হ'লো—জীবনের অমৃত হ'লো আনন্দ, সেই আনন্দ-বঞ্চিত জীবনের বোঝা ব'য়ে নিয়ে সে জগতে ক্ষতি ছাড়া লাভ করেনি। জীবনকে নিষ্পেষিত করে সে কতটা পাপ করেছে, আজ বিকশিত জীবনের আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্ত্তগুলির স্পর্শ পেয়ে সে বুঝতে পারলো। সুবীরের ইচ্ছে হ'লো যে আজ এই আনন্দের প্রস্রবণে সঙ্গীতের ঝরণায় সে অবগাহন করে নেবে—এতদিনের স্পন্দনহীন শিরা-উপশিরাগুলিকে সে সঞ্জীবিত করবে।

সঙ্গীত ও নৃত্য থামলো। উমার নৃত্য-ভঙ্গীমায় মুগ্ধ হয়ে সবাই তাকে অভিনন্দন জানালো। মণিকা উমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে সুবীরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। সুবীরের স্বপ্নের ঘোর তখনো কাটেনি—উমাকে অভিবাদন করতে সুবীর ভুলে গেলো।

মণিকা ঠাট্টার হাসি হেসে বললে—উমাকে কেমন লাগলো, সুবীরবাবু?

অদূরে আর একটি মেয়ে বলে উঠলো—এ-তো আর অঞ্জলি নয়।

সুবীর সংযতভাবেই বললো—অঞ্জলি না হলে কি আর ভাল লাগতে নেই।

মণিকা ফিক্ করে হেসে বললো—ভাল লাগলেও বলতে নেই।

অঞ্জলি নীরবে মণিকাকে আঘাত করলো। মণিকা যেন কিছুই বুঝ্‌লোনা।

শান্ত সুবীর হঠাৎ মুখর হয়ে উঠলো। সে উমাকে বললে—আপনার নাচই আমাদের দেশের পক্ষে প্রয়োজন। দেশের প্রাণটা গেছে শুকিয়ে—তাদের বুকে আশা নেই, মনে আনন্দ নেই, মুখে হাসি নেই। আপনাদের নাচ হ'বে দেশের সম্পদ্—সেই ধনে দেশবাসী হ'বে ধনী।

উমা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলো। সে নাচ শিখেছে ভায়েদের ইচ্ছায় এবং নাচে বন্ধুদের অনুরোধে। সে নেচে দেশের সম্পদ্ বাড়িয়ে দিয়েছে, একথা সে কোনদিন ভাবেনি এবং তার জানাও ছিলোনা। তার নাচ দেখে অনেকে তৃপ্তি পেয়েছে বটে, কিন্তু দেশের শুষ্ক প্রাণকে সে আনন্দে সিঞ্চিত করে দেবে, এতো বড় চেষ্টা সে কখনো করবে বলে ভাবেনি। উমা তার ডাগর চোখে চেয়ে রইলো—বিস্ময় ও পুলক যেন ঠিক্‌রিয়ে পড়তে লাগলো।

মণিকা বললে—আপনারা কংগ্রেসে তো প্রাণকে শুকিয়েই বাহবা নিতে চান্। সেখানে আনন্দোচ্ছলতা যে পাপ। সেদিন আমাদের জগন্নাথ হলে ছিলো উৎসব—কংগ্রেস ভলান্টিয়ারগণ

এসে বললে যে উৎসবানুষ্ঠান হোক্ কিন্তু গান চলবেনা, কারণ সে তারিখ ছিল সুভাস বোসের জেলে যাবার তারিখ। সেদিনকার উৎসবকে পঙ্গু করে সগর্ব্বে তারা চলে গেলো—ভাবলো দেশের মস্ত বড় একটা কাজ হয়ে গেলো এবং দেশটা স্বরাজের পথে অনেকটা এগিয়ে গেলো।

এতগুলো সজীব প্রাণের কাছে সুবীরের কংগ্রেসক্লিষ্টপ্রাণ যেন ছোট হয়ে গেলো। সুবীরের যেন মনে হ'লো যে কংগ্রেস-ভলান্টিয়ারগণ অন্যায় করেছিলো এবং তার কংগ্রেসের তরফ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করা দরকার।

সুবীর অনুতপ্তচিত্তে বললে—সে ভুল আমরা বুঝতে পেরেছি। দেশের কাজের একমাত্র অধিকারী যে কংগ্রেসভলান্টিয়ারগণ নন্ এবং কংগ্রেসভলান্টিয়ারের কাজই একমাত্র দেশের কাজ নয়—সে কথা আজ বিনা সঙ্কোচে স্বীকার করছি।

মণিকা খুসী হয়ে বললো—যাহোক্, সেদিন আমাদের আচরণে দেশময় যে ছি ছি রব উঠেছিলো, তা যে সত্যিই ছি ছি'র ব্যাপার নয়, একথা আপনার মুখ থেকে শুনে আমরা খুসী হ'লাম।

অনুতাপ প্রকাশ করে সুবীর যেন নিজেকে একটু হাল্‌কা অনুভব করলো।

সুমধুর অপরাহ্ণবেলা যখন সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেলো, তখন আসর ভাঙলো। মণিকা তার চোখের তৃপ্তিতে আনন্দ জানালো, অঞ্জলি ও সুবীর ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো।

আজ সুবীরের মন ছিলো ভরা—একটু ঝলক্ লাগলেই উপ্‌চে পড়ছিলো।

পথে যেতে যেতে অঞ্জলি এক চোখ চেয়ে বললে—উমার নাচকে কিন্তু সত্যিই প্রশংসা করতে হ'বে। তোমার কেমন লাগলো ?

অঞ্জলির কথা শুনে সুবীরের চোখের সামনে যেন সেই নৃত্যশীলা উমার ছন্দময়ী ভঙ্গিমা ভেসে উঠ্‌লো।

আনন্দোচ্ছল চোখে হাসি-ভরা মুখে সুবীর বললে—আমি তো নাচ বেশী দেখিনি, তাই বিশ্লেষণ করে বলতে পারবোনা। কিন্তু আজকের নাচ আমার খুব ভালো লেগেছে। সেই নাচ দেখলে মনে হয় যে উমাদেবী যেন কাঁচা ঘুম থেকে উঠে এসেছেন—চোখে আছে স্বপ্নের জড়তা এবং দেহে আছে নিদ্রার অলসতা। সেই অলস দেহ যখন গানের সুরে ও লীলায়িত ছন্দে দুলে উঠ্‌লো, আমাকে সত্যিই তা তৃপ্তি দিয়েছিলো প্রচুরভাবে।

আজ এই অপরাহ্নের নৃত্য-মুখর উৎসবকে সুবীর অপ্রশংসার চোখে দেখেনি শুনে অঞ্জলি নিশ্চিন্ত। তার ভয় হয়েছিলো হয়তো সুবীরের সুকঠিন মন রূপ ও রসের লুকোচুরি খেলাকে যথোচিত সম্মান দেখাতে পারবে না। কিন্তু তার আশঙ্কা অমূলক দেখে অঞ্জলি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো।

সুবীরের মনে হ'লো যে আজ যেন তার হৃদয়ের সমস্ত অবরুদ্ধ জানালাগুলি খুলে গেছে—ধরণীর রূপ, রস ও গন্ধ তাকে আজ বিভোর করে দিলো।

জীবনে যারা সফলতা অর্জ্জন করেনি, অপরের স্খলনে ও পতনে তারাই সব চেয়ে খুসী হয়, এবং যারা নিষ্ক্রিয়, পরনিন্দা তাদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়। বিজয় রাবেয়াকে গান শেখাতে আসতো, পাড়ার লোকেরা কাণাকাণি করে বলতো যে গান শেখানো বিজয়ের উদ্দেশ্য নয়। রাবেয়া বিজয়ের সঙ্গে বেড়াতে যেতো, পাড়ার ছেলেরা নিন্দা রটিয়ে বেড়াতো। এই ভাবে রাবেয়া-বিজয় সংবাদ অতিরঞ্জিত হয়ে বাইরে প্রচারিত হ'তো—যুবকদের চোখ ঈর্ষায় নীল হ'য়ে উঠ্‌তো এবং পাড়ার লোকের মুখ ক্রোধে রাঙা হ'য়ে উঠ্‌তো। এম্‌নি ভাবে সমাজের যাঁতাকলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পিষ্ট হ'তো। রাবেয়ার জীবনের প্রতি ঘটনার প্রতি প্রতিবেশীদের অহেতুক কৌতূহল, আর প্রতি পদক্ষেপ প্রতিবেশীদের কঠিন দৃষ্টি এড়াতে পারে না। মনে হ'লো যেন রাবেয়ার গতিবিধির ভার প্রতিবেশীদের ওপর ন্যস্ত হ'য়েছে। প্রতিবেশীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যদি রাবেয়ার জীবনে রোমান্সের রঙীন সূতোর কোন কঠিন গাঁট লেগে যায়, অশিষ্টতার খাপ্ থেকে যে সমালোচনার তরবারি দেখা দেবে, তার আঘাতে ব্যক্তিগত জীবনের গোপনতা জনতার রূক্ষ আলোতে ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের যা কিছু গোপনতম, তা' নিয়ে প্রতিবেশীদের ঈর্ষাকাতর আলোচনা—এইভাবে রাবেয়ার ব্যক্তিগত জীবন ঠক্কর্ খেতে খেতে এগুতো লাগলো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রাবেয়া ভরা মন নিয়ে নীরেনের বাড়ী থেকে ফিরে এসেছিলো। নীরেনের বাড়ীতে ছিলো চায়ের নিমন্ত্রণ—অঞ্জলি ও সুবীরের অভিনন্দন উপলক্ষে। নীরেনের স্বভাব শান্ত—তাই রাবেয়া সর্ব্বদাই তাকে খোঁচা দিয়ে কথা বলে। রাবেয়া ভাবে যে নীরেনের ভিতর যে সুপ্ত পুরুষ আছে, তাকে জাগিয়ে নিতে হ'বে। নীরেনের মিঠে স্বভাব রাবেয়ার কাছে আলুনী লাগে—তাতে যথোচিত ঝাল ও নুনের আবশ্যক।

রাবেয়ার খোঁচা খেয়ে নীরেন বললে—মেয়েদের ভালবাসা মদের ফেনার মত—অপেক্ষা করতে গেলে, তা' আপনা হ'তেই উবে যাবে।

অঞ্জলি হেসে বললে—উবে যাবার পরও যা অবশিষ্ট থাকে, তা-ও কি ফেলে দেবার জিনিষ, নীরেন বাবু?

রাবেয়া বললে—যে পুরুষ ভালবাসতে গিয়ে বিচার করতে বসে এবং ভালবাসা পাবার জন্ম অপেক্ষা করে, তাদের ভাগ্যে যদি সবটাই উবে যায়, অপরাধ সেই পুরুষের।

অঞ্জলি বললে—সতিাই নীরেন বাবু, ভালবাসা বিতর্কের ওপর নির্ভর করে না। বসন্তে পাতায় পাতায় রং ধরে উঠে—পাখীরা কলরব করে—এর তো কোন হেতু নেই।

নীরেন সুবীরের দিকে তাকালো, রাবেয়াকে লক্ষ্য করলো এবং অঞ্জলিকে বললে—হেতু নেই বটে, কিন্তু ঋতু আছে—অর্থাৎ পাতায় রং ধরারও সময় আছে এবং প্রকৃতির প্রস্তুতি চাই। এই রং ধরার সময় পার হয়ে গেলে পাতা আবার মলিন

হ'য়ে উঠ্‌বে। বসন্তের এই ক্ষণিক ব্যঞ্জনা আমার কাছে মনে হয় প্রতারণা।

অঞ্জলির ভাসা চোখ হেসে উঠ্‌লো, সে চট্ ক'রে বললে—সেই ক্ষণিক ব্যঞ্জনাকে চিরন্তন করবার জন্যেই আমাদের জীবনে সঞ্চয় বাড়িয়ে যেতে হয়। সঞ্চয়ের অভাবে জীবন যদি রসহীন হয়ে উঠে, ধরণীর রূপ, রস ও গন্ধকে প্রতারণা বলে ঘোষণা করলে শুধু নিজেকেই প্রবঞ্চনা করা হ'বে। প্রাণের মধুকে স্মরণ করে সেই নশ্বর মুহূর্ত্তকে অবিনশ্বর করে রাখতে হ'বে—বসন্তের রঙের খেলায় নিজের মনকে রাঙিয়ে নিতে হ'বে। বাইরের রঙের খেলা হয়তো শেষ হ'বে কিন্তু মনের রঙের খেলায় তখনো চলবে অভিসার।

নীরেন আশ্চর্য্যান্বিত হ'লো—অঞ্জলি আজ মুখর হ'য়ে উঠেছে।

নীরেনের মনে হ'লো যে ফাগুনের আগুন এখনও তার মনকে স্পর্শ করে যায়নি—মুহূর্ত্তকে চিরন্তন করবার সোনার কাঠির সন্ধান এখনও বোধ হয় সে পায় নি।

অঞ্জলি আবার বললে—ফাগুনের আগুন যে মনকে তাতিয়ে দেয়নি, সে মনে বাণী নেই, সে-জীবন স্তব্ধ। ধরণীর আকাশে-বাতাসে যে মিলনোৎসব, সেই উৎসবে যোগ দেবার যার রুচি নেই, সে তো নিঃস্ব—তার কাছে কিছুই মিলবে না, তার সঙ্গ শুধু পীড়া দেবে।

অঞ্জলির কথাগুলো রাবেয়ার কাছে খুব ভাল লেগেছিলো। রাবেয়ার মন অঞ্জলির কথাতে ভরে উঠ্‌লো—সেই ভরা-মনে

রাবেয়া বাড়ী ফিরলো। বাড়ী এসে দেখে বিজয় রাবেয়ার পড়বার ঘরে টেবিল হার্মোনিয়ামের কাছে চুপ করে বসে বসে সিগারেট পোড়াচ্ছে।

রাবেয়া ঘরে ঢুকেই "বিজয়দা" বলে ডাক দিলো।

বিজয় চম্‌কে উঠলো এবং হাতের অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা মেঝের উপরে পড়ে গেলো, বিজয় জুতা দিয়ে ওটা মাড়িয়ে দিলো।

রাবেয়া হেসে বললে—চম্‌কাবেন না, আপনিতো অপরাধী নন্‌।

এই বলে রাবেয়া বিজয়ের চেয়ারের বাঁদিকে হাতের উপরে বসে পা দোলাতে দোলাতে বললে—আচ্ছা, বিজয়দা, যদি কেউ এভাবে আমাদের দেখে, সে কি বল্‌বে।

বিজয় হতভম্ব হয়ে গেছে—তার মনে হ'লো যে শিরার ভিতরে রক্তের গতি যেন থেমে গেছে। তার শরীর শ্লথ হয়ে আস্‌ছে এবং একটু পরেই অবশ হ'য়ে যাবে। রাবেয়া নিজের ডান হাতখানা বিজয়ের মাথার উপর দিয়ে নিয়ে চেয়ারের ডান দিকে রাখলে।

রাবেয়া তেমনি শান্তভাবে বললে—জানেন বিজয়দা, আমাদের নামে কি বদ্‌নাম বাইরে রটেছে? আপনি 'সেদিন যে রুমালখানা আমায় দিয়েছিলেন, সবাই কাণাকাণি করছে যে সে-রুমালখানা আপনার পকেটে অনেকে দেখেছে। ওরা আরও বলছে যে আপনার গান শেখানো হ'ল অজুহাত—উদ্দেশ্য নয়। সত্যিই বিজয়দা? আচ্ছা, আপনার উদ্দেশ্যটা কি, তা কি ওরা বলেছে?

বিজয় কম্পিত কণ্ঠে বললে—"ওরা" আপনি কাদের বলছেন ?

রাবেয়া দাঁড়িয়ে উঠে বললো—এই আপনার পাড়ার বন্ধুরা।

রাবেয়া পাশের একটা চৌকি গ্রহণ করলো।

বিজয় অনেকটা সুস্থ হলো।

রাবেয়া জিজ্ঞাসুনেত্রে বললো—আচ্ছা, আমাদের কথা নিয়ে ওরা এতো কথা বলে কেন ? ওদের তো আমরা কিছু ক্ষতি করিনি।

বিজয় পাড়ার বন্ধুদের প্রতি উষ্মা প্রকাশ করে বললে—তা ওরা বলে বলুক, এ তো আর সত্যি নয়।

রাবেয়া কিছুক্ষণ বিজয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে—যদি ওদের রটনাটাই সত্য হ'তো।

তারপর একটু থমকে রাবেয়া চোখ-ভরা দুষ্টুমির হাসি নিয়ে বললে—আচ্ছা বিজয়দা, এমনও তো হ'তে পারে যে ওরা যা বলছে, তা' একেবারে মিথ্যে নয়। ওরা যে বলে যে এই পোড়া দেহটার প্রতি তোমার লোভ কম নয়। আর যদি সত্যিই হয় যে তোমাকে আমার ভাল লাগে—তুমি যখন গান শিখিয়েছ, আমার দৃষ্টি ছিল তোমার ওপর, তোমার গানের দিকে নয়।

বিজয় লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। সে তবু কম্পিত কণ্ঠে বললে—নিন্দুকের রসনা তা'হলে ধন্য হোক্।

রাবেয়া একটু দৃঢ়স্বরে বললে—তার মানে বোঝেন ?

তারপরেই রাবেয়া হেসে উঠ্‌লো—রাবেয়ার সমস্ত দেহলতার দোলায় বিজয় বিমুগ্ধ হ'লো।

বিজয় একটা সিগারেট্ জালিয়ে বললে—আপনি সিগারেট্ খেলে বেশ মা নাতো।

রাবেয়া যেন স্বপ্নজড়িত চোখে বললে—আপনার ভাল লাগতো বলুন।

রাবেয়া বিজয়ের হাত থেকে সিগারেট্টা নিয়ে একবার মুখে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠ্‌লো। বিজয় ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো।

এই ভাবে কিছুক্ষণ কাট্‌লো।

বিজয় হঠাৎ বলে উঠ্‌লো—ওঃ, আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে আমাদের পাড়ার একটি ছেলে আমায় অনুরোধ করেছিলো—যদি আপনার আপত্তি না থাকে······

রাবেয়া অন্যমনস্ক ভাবে বললে—জনতা ডেকে এনে আঙিনায় কলরব বাড়িয়ে লাভ কি, বিজয়দা?

বিজয় চট্ করে বললে—সে কলরব বাড়াতে আসতে চায়না—সে চায় আপনার আঙিনায় এক কোণে স্থান পেয়ে তার স্তব-গান শোনাবার জন্যে।

রাবেয়া উৎসুক নেত্রে বিজয়ের দিকে চেয়ে বললে—তার মানে?

বিজয় বললে—সে ছেলেটি জগন্নাথ ইন্টারমেডিয়েটের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছেলে। আপনারা সেবার সত্যাগ্রহের সাহায্যের জন্যে জগন্নাথ হলে "শেষ রক্ষা" অভিনয় করেছিলেন। আপনার 'ইন্দুমতী'র অভিনয় দেখে সে ছেলেটি এতোটা মুগ্ধ হয়েছে যে

আপনার পদপ্রান্তে বসে সে তার সুদীর্ঘ উচ্ছ্বসিত ছন্দোবদ্ধ স্তবসঙ্গীত আপনাকে না শোনাতে পারলে তার জীবনই না-কি ব্যর্থ যাবে। সে বলে যে আপনি দেবী—আপনার মন্দিরে সে শুধু গোপনে তার অর্ঘ্য নিবেদন করে যাবে। তার কোন প্রার্থনা নেই—সে কোন বর চাইবে না।

রাবেয়া হাসলে। সে মনে মনে ভাবলে যে পুরুষদের একটা স্বপ্নের বয়স আছে যখন তারা নারীদের করুণা প্রার্থনা করে, দেবীরূপে আরাধনা করে। কিন্তু নারীতো দেবী নয়—তার দেবীত্ব পুরুষের রঙীন্ কল্পনায়।

রাবেয়া কোমলকণ্ঠে বললে—বিজয়দা, তাকে দূরে রাখুন। কাছে এলে তার প্রতিমার খড়কুটো দেখা যাবে, তার স্তবগান ও শেষ হ'বে। বয়সের ঝাপ্টায় তার রঙীন স্বপ্ন যখন কাটবে, তার স্তবসঙ্গীত আপ্‌না হ'তেই সমে এসে পৌছবে, কিন্তু সান্নিধ্যের আবর্ত্তনে তার দেবী কল্পনা যদি ব্যর্থ হয়—জীবনের তার ছিঁড়ে যাবে, সুর কেটে যাবে, সেই দুর্য্যোগের হাত থেকে আপনার কিশোর বন্ধুকে বাঁচান। এই উন্মেষের সময় তাকে বেসুরো করে তুলবেন না।

বিজয় বললে—কিন্তু তার করুণ মিনতি যদি শুন্‌তেন, উপেক্ষা করা আপনার পক্ষেও কঠিন হ'তো।

রাবেয়া বললে—ওই মিনতিই তার হৃদয়ের সম্পদ্। তার মিনতি যেন শেষ না হয় কিন্তু প্রার্থনা ও মঞ্জুর করবেন্ না।

বিজয়ের নিজের কথা মনে পড়ে গেলো যে, সে নিজে একদিন

রাবেয়ার সঙ্গে পরিচয় লাভ করবার জন্ত এমনি ভাবেই উৎসুক হ'য়েছিলো। দেবীরূপে আরাধনা অবশ্য সে করেনি, কারণ হৃদয়ের রক্তমাংসের ভিতর তার পরিচয়াভিলাষ ছিলো লুকানো। সেদিনকার কথা মনে পড়াতে বিজয়ের সমস্ত শরীর শিউরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো।

উয়ারীর স্বরাজসঙ্ঘের ছেলেদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিলো—তারা বিজয়ের গতিবিধিকে সমর্থন করতে পারলো না। সঙ্ঘের ছেলেরা সাধারণতঃ ভোরবেলায় আখ্ড়ায় এসে "প্যারালাল বার" অভ্যাস করে, পড়বার সময় আয়নার সম্মুখে মাস্‌ল্ কন্‌ট্রোল অভ্যাস করে, স্কুল কলেজে গিয়ে ষ্ট্রাইকের বন্দোবস্ত করে এবং বিকেলবেলায় খেলার মাঠে হকি ষ্টিক নিয়ে মারামারি করে। আবার তারা জলপ্লাবনের সময় চাঁদা তোলে, কনফারেন্স হ'লে ভলাণ্টিয়ারি করে, দাঙ্গা হ'লে গৃহস্থের বাড়ী পাহারা দেয়, মহামারি লাগলে ঔষধ বিতরণ করে এবং দেশের কোন কাজ না থাকলে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। এই সব ছেলেদের হঠাৎ খেয়াল হ'লো যে বিজয় গেণ্ডারিয়ার ছেলে—সে কেন উয়ারীর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবে? বিজয় রাবেয়ার সঙ্গে প্রেম করছে কি-না, সে সংবাদ সংগ্রহ করবার ধৈর্য্য তাদের ছিলোনা—তারা বিজয়ের নামে যা শুনেছিলো, তা' সবটাই বিশ্বাস করলো এবং আর যা' কিছু শোনবার ইচ্ছা ছিলো, তা' রটনা করে বেড়াতে লাগলো। বিজয়ের ভাই গেণ্ডারিয়ার সন্তানসঙ্ঘের সম্পাদক এবং স্বরাজসঙ্ঘের সন্তানরা দেখলো যে তাদের আক্রোশ মেটাবার এই সব চেয়ে বড় সুযোগ। তারা ঠিক করলে যে বিজয়কে এমন শাস্তি দেবে যে বিজয় যেন কিছুকাল এ পাড়ায় না আসতে পারে।

বিজয় এতটা শাস্তি পাবার মত অপরাধ করেছে কি-না, তা' তাদের বিচার্য্য ছিলোনা। তাদের কাছে এই অপরাধই াব চেয়ে বড় অপরাধ যে বিজয় বে-পাড়ার ছেলে এবং তার াই নবীনসঙ্ঘের সম্পাদক। এই পাড়া-প্রীতি ছিল সঙ্ঘের ছলেদের সবিশেষ ধর্ম্ম।

সঙ্ঘের ছেলেরা হঠাৎ একদিন রাবেয়ার বাবার কাছে গিয়ে পস্থিত। তিনি অতি অমায়িক লোক। রাবেয়ার বাবা গদীশবাবু ছেলেদের আদর করে বসালেন। ছেলেদের মধ্যে াথ চাওয়া-চাওয়ি চলতে লাগলো। একজন ছেলে ডান হাতের ইসেপ্‌কে বাঁ হাত দিয়ে মর্দ্দন করে এগিয়ে এসে বললে— ণ্ডারিয়ার বিজয়বাবু আপনার বাড়ীতে এসে আপনার মেয়ের দ এতো মেলা মেশা করেন, এটা আমরা পছন্দ করিনে। নেন গেণ্ডারিয়ার ছেলেদের ভাল নাম নেই—কারণ ওখানকার য়েদের নামে অনেক কিছু কুৎসা আছে।

জগদীশবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন। বিজয় গেণ্ডারিয়ায় থাকে, থা তিনি জানতেন কিন্তু গেণ্ডারিয়ায় থাকার জন্য বিজয়ের ক তার বাসায় এসে রাবেয়ার সঙ্গে মেলামেশা করায় রাধ, একথাটা তিনি জানতেন না। ছেলেদের কথায় জয়ের অপরাধটা জানলেন বটে কিন্তু অপরাধের হেতুটা অজানাই য় গেলো।

জগদীশবাবু খুব নিম্নস্বরে বললেন—এতে কোন অপরাধ ল তো জানিনে। বিজয় আমার বাড়ীতে আসে আমার

মেয়েকে গান শেখাতে—তাতে যদি ওদের সঙ্গে একটু মেলা-মেশা হয়, তাতে অপরাধটা কোথায় বলতে পারো ?

ছেলেরা জগদীশবাবুর তার্কিক মনকে প্রশংসা করতে পারলোনা। সেই ছেলেটি দৃঢ়স্বরে বললে—আমরা ঠিক্ করেছি যে বিজয়বাবু আর আপনাদের বাড়ীতে আসতে পারবেন না। আমরা দেখবো যে বিজয়বাবু যেন আপনার মেয়ের সঙ্গে মিশতে না পারেন।

জগদীশবাবু প্রথমটা বুঝতে পারলেন না যে বিজয় তার বাড়ীতে আসবে এবং তার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করবে, এতে পাড়ার ছেলেদের ঠিক্ করবার কি আছে। তারা কাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবেন, তাতেও কি পাড়ার ছেলেদের অনুমোদন নিতে হ'বে ? তবুও জগদীশবাবু মাথা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে বললেন—আচ্ছা, আমি আমার স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করে আসি।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে জগদীশবাবু বললেন—বিজয় আমাদের পরিবারের বন্ধু—তার আসা না-আসা আপনাদের কোন অসুবিধে সৃষ্টি করবে বলে মনে হ'য়না।

সঙ্ঘের আর একটি ছেলে তড়াক্ করে উঠে স্পষ্ট বলে দিলে—মশাই, গেণ্ডারিয়ার ছেলে এসে উয়ারীর মেয়েদের সঙ্গে ঢলাঢলি করবে, তা' আমরা হ'তে দেবোনা, সইতে পারবোনা।

জগদীশবাবু বিস্ময়ে হাঁ করে রইলেন—জগদীশবাবুর স্ত্রী পর্দার অন্তরাল থেকে বলে উঠ্‌লেন—আমার মেয়ের ভালমন্দ

আমি বুঝবো। যে সব হ্যাংলা ছেলে আমার মেয়ের পেছনে পেছনে ঘোরে, তাদের কথায় আমি আমাদের পরিবারের বন্ধু হারাতে পারিনে।

তাঁর কথাতে প্রচুর ঝাঁঝ ছিলো।

অন্তরালের বাণী শুনে ছেলেরা সবাই ধীরে ধীরে চলে গেলো। জগদীশবাবুর মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগলো, কারণ তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যে ছেলেদের তাড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই। অথচ ছেলেদের অনুরোধ এতই অসঙ্গত যে, অনুরোধ রক্ষার উপায় থাকলেও রক্ষা করা ভদ্রতা নয়।

সুধীর স্বরাজসঙ্ঘের সহঃসভাপতি। সুধীর সঙ্ঘের সভ্যদের আচরণ জানতে পেরে তিরস্কার করলে—অঞ্জলি জানতে পেরে পাড়ার ছেলেদের ব্যবহারে লজ্জা অনুভব করলো। সঙ্ঘের ছেলেরা অনুতাপের কোন চিহ্ন দেখালোনা—তারা যেন তাদের সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় জয়লাভ করে এসেছে, এমন ভাব দেখালে।

সুবীরকে অঞ্জলি বলেছিলো সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাসায় ফিরতে কারণ সন্ধ্যায় তারা দু'জনে রমণায় বেড়াতে যাবে। অঞ্জলির আজকাল জনতা ভাল লাগেনা—অথচ স্কুল কলেজে অঞ্জলি ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়। অঞ্জলি বাচাল নয় কিন্তু কথা বলতে জানে, অঞ্জলি অস্থিরচিত্ত নয় কিন্তু সপ্রতিভ ব্যবহার করতে জানে। অঞ্জলির ব্যবহার মধুর, চালচলন ভদ্র, কথাবার্ত্তা প্রিয়। তার বন্ধুনীরা তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতো—সে খেলায় যোগ দিতো। বিয়ের পরও তার বান্ধবীরা তাকে ছাড়েনি—তার বাড়ী এসে উপদ্রব করতো, গান বাজনা করতো, ঠাট্টা তামাসা করে বাড়ী ফিরে যেতো, সে সপতি বন্ধুদের হল্লায় যোগ দিতো। অত্যাচার অঞ্জলিরও ভাল লাগতো কিন্তু সুবীরের উপস্থিতি থাকা চাই। বন্ধুরা বিদ্রূপ করতে ছাড়তোনা—অঞ্জলির উত্তর দিতে কিছুই বাধতোনা।

বন্ধুরা বিদ্রূপ করে বলতো—স্বামী ছাড়া ভাই মুহূর্ত্তও থাকতে পারিসনে।

অঞ্জলি খুসী হ'য়ে বলতো—মুহূর্ত্তকে হারালে তো ভাই ফিরে আসবেনা—অর্থহীন লজ্জায় সেই মুহূর্ত্তকে ঘুলিয়ে ফেলে লাভ কি।

বন্ধুরা বলে উঠে—এই লাভ ক্ষতির টন্‌টনে জ্ঞান কবে থেকে হ'লো?

অঞ্জলি মুখ টিপে উত্তর দেয়—সেই দিন-ক্ষণ তো তোদের জানানো হ'য়েছিলো।

হাসির সুরা পান করে সবাই হ'লে উঠ্‌তো—সুবীর একপ্রান্তে সঙ্কুচিত হ'য়ে ব'সে থাকতো। সুবীর দেখ্‌তো—সুবীরের ভাল লাগতো—কিন্তু সুবীর কিছুই বলতোনা।

সুবীর বাসায় ফিরলো রাত দশটার পরে। সুবীরের কাতর প্রার্থনা বন্ধুরা শোনেনি—তাকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে পিকচার হাউসে বায়স্কোপ দেখে এলো। পাছে লোকে তাকে স্ত্রৈণ বলে, এই ভয়ে সুবীর অভদ্রভাবে "না" বলতে পারলোনা। এরই মধ্যে সুবীর কি রকম বউ-পাগলা, তার প্রমাণ বন্ধুরা না-কি সংগ্রহ করেছে।

সুবীরের বন্ধু সীতেশ বললে—ভাই, বড় ঘরের মেয়ে বিয়ে করেছো বলে দরিদ্রের সম্মান বোধ হারিয়োনা। ওসব ঘরের মেয়েরা স্বামীদের গিলে ফেলতে চায়—ওদের কাছে গৌরব হারিয়োনা।

সুবীরের কথাগুলো ভাল লাগেনা, অথচ হেসে বলে—বড় লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছি বলেইতো আর দাসখৎ লিখে দেইনি।

সুবীরের কংগ্রেস বন্ধু হেম বলে—ওসব মেয়েদের ন্যাকামি ভাই আমি সইতে পারিনে। ওরা হাল্‌কা চালে চলে, মনে হয় নেচে বেড়ায়। ওরা সুর করে কথা বলে—মনে হয় ভয়ঙ্ দেখাচ্ছে। ওরা দেহকে আঁটসাঁট ভাবে জড়িয়ে কাপড় পরে—

যেন ভেল্কীবাজী দেখাবে। ওরা পথিককে চমকিয়ে দেয়—পথের অন্তরালে আত্মগোপন করতে ভালবাসেনা। ওরা পথিকের চেয়ে পথকে ভালবাসে বেশী—পথের খানায় ফেলে দিয়ে ওদের শাস্তি দিতে হয়।

সুবীরের এক অধ্যাপক বন্ধু বলে—ওদের ভাই সমাজ গড়ে' তোলেনি—ওদের রূপ দিয়েছে 'সেক্‌স্‌'। ওই 'সেক্‌সের' পালিশ করা ফিকে রূপ নিয়ে ওরা দম্ভ করে—সেই দম্ভকে আমাদের ভাঙতে হ'বে।

সবাই হো হো করে হেসে উঠ্‌লো—মনে হ'লো তাদের হাসির বন্যায় ধনীর মেয়েদের আভিজাত্য ঐরাবত ভেসে গেলো।

সুবীর যখন বাসায় পৌছলো, তখন অঞ্জলির খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। শোবার ঘরে অঞ্জলি রবীন্দ্রনাথের "লিপিকা" নিয়ে নাড়াচাড়া কর্চ্ছিলো—মনে কালো মেঘ জমাট্‌ বেঁধেছে। সুবীর ঘরে ঢুকলো—অঞ্জলি গিয়ে বিছানায় শুয়ে প[ড়]লো। সুবীর বুঝলে যে অঞ্জলি রাগ করেছে। বায়োস্কোপ দেখেছে বলে সুবীরের অনুতাপ হ'লো—বন্ধুরা অসঙ্গত অ[নুরো]ধ করেছে বলে তাদের ওপর রাগ হ'লো, সুবীর তার নিজের অপরাধের পরিমাণ খানিকটা বুঝতে পারলো। কোণের এক টেবিলে খাবার ঢাকা ছিলো—সুবীর তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে পাশের বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে এসে একটি সোফাতে বসলো। অঞ্জলি যে ভাবে শুয়েছিলো সেদিক্‌ থেকে সুবীরকে দেখা যায় বলে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইলো। সুবীর খাটের ওপর এসে অঞ্জলিকে

জোর করে ধরে আলুগোছে একটি ছোট্ট চুমা দিলো। অঞ্জলি আরও কঠিন হ'য়ে সুধীরের হাত সরিয়ে দিয়ে চোখ বুজে রইলো।

সুধীর জানতো যে কথা বল্‌লে অঞ্জলির বক্ষ অভিমান চোখের জলে বিগলিত হ'য়ে যাবে। তাই সুধীর কথা না বলে আদর করতে আরম্ভ করলো। অঞ্জলি যতই আদর প্রত্যাখ্যান করতে চেষ্টা করে, সুধীর ততই আবেগের সঙ্গে সোহাগ করে তার অনুপস্থিতির প্রায়শ্চিত্ত করতে লাগলো।

অঞ্জলি রাগের ভাণ করে বললে—যখন বাইরে থাকো, তখন থাকো আমাদের ভুলে। আর যখন দেখা হ'য়, তখন তোমাদের সোহাগ—যেন সত্যিই তোমরা ভালবাসো।

কথাটা কঠিন হ'লেও সুধীর সন্তোষের সঙ্গে উত্তর দিলে—ভুলে আমরা থাকিনে এবং ভালও আমরা বাসি—তবুও যদি বাইরে থাকি, ভাববে নিতান্ত প্রয়োজনে, নিজের ইচ্ছায় নয়।

অঞ্জলি মুখ ভার করে বললে—বাইরের প্রয়োজনটাই তোমাদের হ'ল বেশী—আমরা তো উদ্বৃত্ত, ফাউ, প্রয়োজনের নয়।

কথা বলবার সময় অঞ্জলির রাঙা ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠেছিলো।

সুধীর বললে—ছিঃ, তোমাদের তো আমরা একান্ত ভাবেই চাই—তা না হ'লে বাইরের প্রয়োজনও যে আমাদের কাছে মিথ্যা হ'য়ে উঠ্‌তো। তোমাকে অন্তরে পেয়েছি বলেই তো বাইরের জগৎ আমাদের কাছে এতো মনোরম; বাইরের খুঁটিনাটি কাজে আমাদের এতো উৎসাহ।

অঞ্জলি চোখ চেয়ে বললে—আমরা যে বাইরের নিষ্ঠুর জগৎ হ'তে তোমাদের টেনে আনতে চাই আমাদের দাক্ষিণ্যপূর্ণ অন্তরাকাশে, আমাদের অন্তরগ্রহে তোমাদের সম্পূর্ণ স্থান হোক্‌, এইতো আমরা চাই। যে কক্ষচ্যুত হ'য়ে যায়, সে-তো আমাদের অন্তরগ্রহের অভিসম্পাত। এই পৃথিবীর সূর্য্যগ্রহ হ'তে আমাদের গৃহের মঙ্গলগ্রহে তোমাদের চাই, তাই অন্য গ্রহের আকর্ষণ আমরা সইতে পারিনে।

সুবীর আদর করে বললে—পুরুষের গতিকে বন্ধ করোনা, অঞ্জলি। তোমরা আমাদের গতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবে। যে পুরুষ মেয়েদের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে গৃহের প্রাচীরের মধ্যে আশ্রয় নিলে—সে পুরুষ অন্তরলোকে হারাবে তোমাদের, জগতের মাঝে হারাবে নিজেকে। পুরুষ তোমাদের কাছে পাবে দৃষ্টি কিন্তু বাইরে খুঁজে নিতে হ'বে নিজেকে। যে পুরুষ বাইরের আলোকে ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো, তাকেই তো বলব "ধন্য"।

সুবীর নিজেকে সমর্থন করলো বটে কিন্তু প্রাণে শান্তি পেলোনা। তার ক্ষণে ক্ষণে মনে হ'তে লাগলো যে, সে অঞ্জলির প্রতি অন্যায় করেছে। অঞ্জলি প্রতীক্ষায় অপরাহ্নের যে মুহূর্তগুলিকে সিঞ্চিত করে রেখেছিল, সেই মুহূর্তগুলিকে সে উপেক্ষা করেছে। অঞ্জলি কম্পিত হৃদয়ে তার আগমন চেয়েছিলো, সেই হৃদয়কে সুবীর আঘাত দিয়েছে—অঞ্জলির বুক-ভরা সুধাকে সে হেলাফেলা করেছে।

অঞ্জলি সুবীরের কথা শুনলে কিন্তু মানতে পারলো না।

তার সন্ধ্যাবেলার কথা মনে হতেই চোখ জলে ভরে উঠ্‌লো। অঞ্জলি যে সুবীরকে চায়—সম্পূর্ণভাবে চায়, সে কথা সুবীরকে সে কি ক'রে বলবে। অঞ্জলির বিশ বৎসরের যৌবন যে সুবীরকে ডাক্‌ছে, নিতান্ত অসহায়ভাবে, নিরুপায়ভাবে কিন্তু একান্ত উৎসাহভাবে, উদ্দামতার সঙ্গে, অঞ্জলির সমস্ত দেহ হ'তে বিচ্ছুরিত হ'য়ে এই বাণীটিই সুবীরের চরণে বার বার আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো কিন্তু সুবীর সেই অনুচ্চারিত বাণীর অমোঘ বার্ত্তা শুন্‌লে কি-না, অঞ্জলি তা বুঝতে পারলো না।

সুবীর আদর করে অঞ্জলিকে জড়িয়ে ধরলো, এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো। অঞ্জলির হঠাৎ মনে পড়ে গেলো নীরেনের কথা। নীরেন তাকে বলেছিলো যে আজকাল বেশী রাত না হ'লে তার ঘুম হয় না। অঞ্জলির মনে হ'লো যে নীরেন হয়তো এখনো ঘুমোয়নি। অঞ্জলির সমস্ত শরীর ঘামে হিম হ'য়ে গেলো—মন অবশ হয়ে পড়লো। চুপ করে নীরেনের কথা ভাবতে লগেলো। সুবীর চোরের মত অঞ্জলির বুকের ওপর ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘড়িতে যখন একটা বাজলো, অঞ্জলির মনে হ'লো যে নীরেন এখনও ঘুমুতে যায়নি। সে হয়তো শূন্য ঘরে ইজি-চেয়ারে বসে বসে পড়ছে। নীরেনের শূন্যতা আজ তার বুকে এসে বিঁধল। অঞ্জলি হঠাৎ চুপি চুপি শয্যা থেকে উঠ্‌লো—তার মনে হ'লো যে নীরেন না ঘুমুতে গেলে তার ঘুমানো উচিত নয়। সুইচটা টিপে দেওয়াতে আলো ঘরেতে ছড়িয়ে পড়লো—

দেখলো সুবীর ক্লান্তভাবে ঘুমুচ্ছে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে অঞ্জলি অন্যমনস্কভাবে চুল থেকে কাঁটা খুলতে লাগলো। সমস্ত কবরীটা যখন খুলে পড়লো—অঞ্জলি হাতে খোঁপা বাঁধলো—মুখে স্নো মেখে হেসে উঠলো। তার ইচ্ছে হ'লো যে সে নিজেকে নিজে সাজিয়ে তুলবে। চেষ্ট্ ড্রয়ার থেকে ক্রেপের শাড়ী বার করে পরলো—লাল ব্লাউজ পরলো—সামনে এসেন্সের শিশিটা ছিলো, নিঃশেষ করে ঢেলে দিলে। উগ্র গন্ধে অঞ্জলি নাকটা কুঞ্চিত করলো। ভেলভেটের স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে নিজেকে আবার একটু ভাল করে দেখে নিলে। অঞ্জলির হাসি পেলো।

আলোটা নিভিয়ে পর্দ্দা সরিয়ে অঞ্জলি জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। সুবীর তখন গভীর নিদ্রায়—বাইরে গভীর রাত—অঞ্জলির বুকের গভীর বোঝা তার চোখের গভীর নিদ্রাকে নষ্ট করে দিলো। র‍্যাস্কিন্ ষ্ট্রীটে তখন একটি লোকও চলাফেরা করছে না—এক আধটা পাখী কিচিরমিচির করে উঠলো। জ্যোৎস্না মলিন—তাদের বাড়ীর লনকে শুধু অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। বাইরের ফটক বন্ধ—অঞ্জলি এমনভাবে জানালায় হেলান দিয়ে রইলো যেন সে কারোর অপেক্ষা করছে।

পথের একটা আলো ঢাকা মিউনিসিপেলিটির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে জলছে, তাদের সামনের বাড়ীর অঙ্গনে একটা বড় গাছ আছে, তাকে যেন একটা অন্ধকারের স্তূপের মতন দেখাচ্ছে—মলিন জ্যোৎস্না সেই জায়গায় এসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। আকাশে দু'একটা তারা ছিলো—তার মনে হ'লো যে তারা যেন

আজ বহুদূরে চলে গেছে। আকাশ যে এতো উঁচুতে—তারা যে এতো বহুদূরে, অঞ্জলির যেন এতকাল খেয়াল ছিলোনা। অঞ্জলির মনে হ'লো সবই যেন তার নাগালের বাইরে—তার কাছ থেকে সবাই যেন এতদূরে চলে যাচ্ছে। তার বুকটা কেঁপে উঠলো। সে যেন বিচ্ছিন্নভাবে ধরণীর এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে, সবই তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বহুদূরে —এতোদূরে যে তার দৃষ্টি সেখানে পৌঁছুতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার মনে হ'লো সে একা—তারই সামনে ধরণীর রথচক্র এগিয়ে যাচ্ছে। সে পিছনে পড়ে রইলো—রথ এগিয়ে গেছে—অনেক দূরে। যাত্রীরা দল বেঁধে চলে গেছে—সে একা পড়ে আছে।

হঠাৎ একটা দমকা হওয়া এসে চলে গেলো—তার কুন্তল উড়লো। কপোলের বিকীর্ণ কুন্তলকে সরিয়ে দিতে সে যেন শুনতে পেলো যে বাতাসে একটা গানের সুর ভেসে চলে গেলো। মনে হ'ল এই সুর শেষ পারাবারের সুর—এখনো যারা প্রস্তুত হয়নি, তারা পড়ে থাকবে—একদম্ পিছে পড়ে থাকবে। সেই সুর ক্ষীণতর হ'য়ে এলো—অঞ্জলির যাওয়া হ'লোনা। সমস্ত পৃথিবী তালে তালে চলে গেলো—অঞ্জলি একা নিঃসহায়।

অঞ্জলির চমক্ ভাঙলো—অঞ্জলির মনে হ'লো নীরেন এখন ঘুমিয়েছে। অঞ্জলি সেই পোষাকে ঘুমুতে এলো—দেখলো সুবীর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। অঞ্জলি চোরের মত শুয়ে রইলো—যেন সুবীর টের না পায়, যেন সুবীরের গায়ে স্পর্শ

না পারে। নিশীথের নিস্তব্ধতা অঞ্জলির কাছে অসহনীয় হয়ে উঠলো।

ঢাকার সহর ছোট্ট—পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে যেমন শত্রুতা, তেমন প্রীতি। যা ঘটে তা অতি সহজেই রটে এবং যা রটে, তা অতিরঞ্জিত হ'য়েই উঠে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিজয় পল্টন মাঠ পেরিয়ে গবর্ণমেণ্ট হাউস পাশ কেটে টিকাটুলীর দিকে হাঁটছিলো—কতকগুলি উয়ারীর ছেলে হকিষ্টিক হাতে সেখানে দাঁড়িয়েছিলো। বিজয়ের সঙ্গে দেখা হওয়াতেই তারা বিজয়ের পা লক্ষ্য করে এমন আঘাত করলো যে বিজয় চীৎকার করে পড়ে গেলো। চীৎকার শুনে পাশের এক ডাক্তারের বাড়ী থেকে ছেলেরা বেরিয়ে এলো—যারা মেরেছিলো তারা চট্‌পট্ চলে গেলো। বিজয়কে তারাই ফার্ষ্ট এড্ দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

বিজয় জখম হয়েছে, এই সংবাদ যখন রটলো, তখন দেখা গেলো যে লোকে তার জখম হওয়ার সংবাদটার প্রতি তত ঔৎসুক্য দেখালে না—যতটা দেখালো তার জখম হওয়ার হেতুটার উপর। বিজয়ের মার খাওয়াতে ফল হ'লো যে তার নামে কুৎসা সমস্ত সহরে ছড়িয়ে পড়লো; যারা মারলো, তাদের অসঙ্গত ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করলে না।

কেউ বললে—বিজয় যদি রাবেয়াকে ভালবেসেই থাকে, তাতে অপরাধ কি।

আবার কেউ বললে—আরে রেখে দাও, রাবেয়া থাকে

বিজয়কে ভালবাসতে। সে শুধু ওকে একটু নাচিয়ে বেড়াচ্ছিলো।

রাবেয়া ও বিজয়ের সংবাদ নিয়ে সবাই মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলো। মনে হ'ল ওদের যেন উচিত ছিল পাড়ার দশজনের মতামত নিয়ে প্রেম করা।

গেণ্ডারিয়াতে চাঞ্চল্য দেখা দিলো বেশী। নবীনসঙ্ঘের ছেলেরা চুপিচুপি আলাপ করতে লাগলো। গেণ্ডারিয়ার মেয়েরা বলে বেড়াতে লাগলো যে উয়ারীর মেয়েদের কলঙ্ক বেশী—তারা বেশী বড়াই করলে সব কথা না-কি গেণ্ডারিয়ার মেয়েরা ফাঁস্ করে দেবে। অন্য পাড়ার ছেলেদের মধ্যে আলোচনা হ'তে লাগলো যে কোন্ পাড়ার মেয়েরা ভালো—গেণ্ডারিয়ার, না উয়ারীর? যে সব কুৎসা ঘটেছে, যে সব কুৎসা ঘটেনি কিন্তু ঘটতে পারতো এবং যে সব কুৎসা ঘটবে—এসব নিয়ে ছেলেরা মেয়েরা আলোচনা করতে লাগলো।

বিজয়ের বোন মনীষা পাড়ায় উয়ারীর বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করতে আরম্ভ করলো—মেয়েদের উত্তেজিত করলো। বিজয়ের ব্যাপার নিয়ে উয়ারী ও গেণ্ডারিয়ার মধ্যে সত্যই এক দলাদলি সৃষ্টি হ'লো। এই বিরুদ্ধতা বুড়োদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়লো; পাড়ার ছেলে-মেয়ে নিয়ে এতো বিতর্ক চলাতে অনেক বিস্মৃত কুৎসা আলোচিত হ'তে লাগ্‌লো—অনেক ঘটনা যা চাপা ছিল, তা বাইরে ছড়িয়ে পড়লো এবং আজ যারা পিউরিটান্ গৃহিণী, তারা যৌবনের কথা স্মরণ করে বিজয় ও রাবেয়াকে খুব

অপরাধী বলতে দ্বিধাবোধ করতে লাগলো। একজনের ঘটনা উপলক্ষ্য করে আরও দশজনের অতীত ও ভবিষ্যৎ কুৎসা নিয়ে বিতর্ক চলতে লাগলো, ঢাকার সহর জুড়ে কিছুদিন এই আলোচনাই চললো।

বিজয়ের বোন মনীষা পাশের বাড়ীর মালতীকে গিয়ে বললো—শুনেছিস্ মালতী, উয়ারীর ছেলেরা বলে বেড়াচ্ছে যে গেণ্ডারিয়ার মেয়েরা না-কি খারাপ। তাদের প্রেমে না-কি রুচি নেই, চলায় সংযম নেই, ভালবাসায় নিষ্ঠা নেই। তারা না-কি বাচনে প্রগল্ভ এবং চল্‌তে চল্‌তে চোখে ইসারা করে।

মালতী হাসলো—সে উয়ারীর মেয়ে, গেণ্ডারিয়ার বধূ।

মালতী মনীষার বিশেষ বন্ধু।

মালতী বললে—তাই না-কি? তাহ'লে বল, উয়ারীর ছেলেদের এই পাড়ার দিকে চোখ আছে।

মনীষা বললে—আমরাও তো উয়ারীর খবর জানি। ওদের মেয়েদের বেহায়াপনা তো আর আমাদের অজানা নেই।

মনীষা উয়ারীর মেয়েদের কুৎসার ফিরিস্তি দিতে যাচ্ছিলো।

মালতী তাতে বাধা দিয়ে বললে—ছেলেরা যা' রটায়, তা' তারা বিশ্বাস করেনা। যে মেয়ের বিরুদ্ধে ওরা কুৎসা রটায়, তাকে পেলে ওরা কেউ অস্বীকার করেছে বলে তো আমার জানা নেই। ওরা যাকে চায়, অথচ পায় না অথবা পাবার যোগ্য নয়, তার বিরুদ্ধেই ওদের রসনা মুখর। এটা কোন দিন দেখেছো যে পুরুষ মানুষ কোনদিন নির্গুণ অশিক্ষিতা মেয়েদের

বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এসেছে? যে সুন্দরী, যে গুণী, যে শিক্ষিতা—পুরুষের বিষ তাদের বিরুদ্ধে বেশী। তাই উয়ারীর ছেলেরা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে বলে, বুঝবে উয়ারীর ছেলেরা এখানেই দুর্ব্বল বেশী।

মালতীর কথাগুলো মনীষার কাছে মন্দ লাগলোনা।

মনীষা বললে—সত্যি কথা বলতে কি—অঞ্জলি ছাড়া প্রায় সব মেয়েই একটু যেন আল্‌গা, অঞ্জলির মত শক্ত নয়।

মালতী এক চোখ চেয়ে বললে—কেন ভাই, আমরাই কি এমন ফেল্‌না ছিলুম!

মনীষা চট্‌ করে বলে উঠ্‌লো—না ভাই, তুমি তো আমাদের পাড়ারই হ'য়ে গেছ। তোমার কথা ছেড়ে দাও।

মালতী একটু হাসলো—সে হাসি যে দেখে এবং যখন হাসে, তখন তাকে শক্ত ও সংযত মেয়ে বলা চলেনা। অথচ সেই হাসি যার নেই, জীবন-খেলায় সে বেশীদিন জিততে পারবেনা।

রাবেয়া অঞ্জলির কাছে এসে উপস্থিত হ'লো।

রাবেয়া বললে—যারা অন্যায় করেছে, তাদের সঙ্কোচহীন ঔদ্ধত্য আমাকে সবচেয়ে পীড়া দেয়। বিজয়বাবুকে যারা মার্‌লে, আজ তারা লোকের বাহবা পায়—আমাদের দেশে পৌরুষধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের চমৎকার ধারণা!

অঞ্জলি ছেলেদের ব্যবহারে লজ্জিত। সুধীর স্বরাজ সঙ্ঘের একজন পাণ্ডা—সুধীরকে অঞ্জলি অনেক তিরস্কার করেছে ছেলেদের অন্যায়ের জন্য। সুধীর ছেলেদের ব্যবহারে ব্যথিত হয়েছে।

অঞ্জলি দুষ্টুমির হাসি হেসে বললে—শুনছি, তোর ভালোর জন্যই ছেলেরা হকিস্টিক্ ব্যবহার করেছিলো।

রাবেয়া বিরক্তির সুরে বললে—আমার ভালমন্দের ভার পাড়ার ছেলেদের উপর ন্যস্ত রয়েছে, একথা তাদের কে বললে!

অঞ্জলি আরও ঠাট্টা করে বললে—কে বলবে ভাই, বলেছে তাদের দৃষ্টি। তোর দিকে তাদের দৃষ্টি যদি সজাগ থাকে—তাদের দৃষ্টিদোষ আছে বলা যায় না।

রাবেয়া হেসে ফেললে। বললে—সত্যিই বল ভাই, বিজয়বাবুর অপরাধ কি! আমার সঙ্গে আলাপ থাকাই যদি সিডিশন্—তাহ'লে সিডিশনের অপরাধ তো আমার। আচ্ছা, ওরা কি চায় যে আমি চুপ করে ঘরে বসে থাকবো—কোথাও বেরুব না, কারোর সঙ্গে আলাপ করবোনা।

অঞ্জলি এবার গম্ভীর মুখ করে বললে—ভাই, ওরা কি চায়, তাই কি ছাই ওরা জানে। যদি তাই জানতো, তাহ'লে এই বিশ্রী ব্যাপার ওরা ঘটতে দিতোনা।

রাবেয়া বললে—এখন' ভাই পথে বেরুতে লজ্জা করে—মনে হয় ছেলে-বুড়ো সবাই যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বিজয়বাবুকে মেরেই ওরা থেমে যায়নি—মামার কৈফিয়ৎটা শুনেছিস্ তো!

অঞ্জলি একথাটাই এতোদিন বসে ভেবেছে যে রাবেয়া যদি বিজয়কে ভালবেসেই থাকে, বা বিজয় যদি রাবেয়ার

প্রতি দুর্বল হয়েই থাকে, তাতে পাড়ার ছেলেদের এতো আপত্তি কেন। অঞ্জলি শুনেছে যে বিজয় না-কি রাবেয়ার প্রেমের উপযুক্ত পাত্র নয়, তার এমন কিছু গুণ নেই যার দৌলতে সে রাবেয়াকে পেতে পারে। বিজয় যদি গুণহীন হয়, সে প্রশ্ন তো রাবেয়ার। আর প্রেমের যোগ্যতা যে বাইরের ধন দৌলতের উপর নির্ভর করে, এই সমাধানই বা ছেলেরা কি করে করলে। ছেলেদের অভদ্রতায় অঞ্জলি বিস্মিত হ'লো।

অঞ্জলি বললে—অন্যায় কৈফিয়ৎ দিয়ে যারা অন্যায়কে ঢাকতে চেষ্টা করে, তারাই সবচেয়ে হীন। পাড়ার ছেলেদের হীনতার জন্য আমরা লোকের সামনে যেতে পারিনে।

স্বরাজসঙ্ঘের ছেলেদের ভিতর কথা কাটাকাটি চলতে লাগলো।

একজন বললে—এতো'টা মারা ঠিক্ হয়নি, একটু ভয় দেখিয়ে দিলেই হ'তো।

দ্বিতীয় জন বললে—যারা চোরের মত প্রেম করে, তাদের এই শাস্তিই উপযুক্ত। গানই যদি শেখাবে তো রমণায় বেড়াতে নিয়ে যাবার কি দরকার?

তৃতীয় জন রোষনেত্রে বললে—আরে ভাই, প্রেমই যদি করবে, পাড়া ছেড়ে যাবার দরকার কি? আমাদের উয়ারীতে কি ছেলে নেই যে বে-পাড়ার ছেলের সঙ্গে প্রেম করতে যেতে হ'বে?

চতুর্থ জন বললে—প্রেম কর, বিয়ে কর—আমি সইতে পারি, কিন্তু তার আগে এতো চলাচলি কেন ?

পঞ্চম জন বললে—তোরাও পাগল—ঐ মেয়েরা যাবে বিজয়কে বিয়ে করতে ? যে মেয়ে যার সঙ্গে চলাচলি করে, তাকে কখ্‌খনো বিয়ে করে না। ওরা বিয়ে করে যাদের, তাদের সামনে অতো আলগাভাবে চলে না। যে-মেয়ে নিজেকে সামলাতে পারেনা, সে স্বামীকে সামলাবে কি করে ? তাই সোসাইটি মেয়েরা প্রেম করে একজনের সঙ্গে, বিয়ে করে আর একজনকে।

ষষ্ঠ জন নিরস্বরে বললে—তাই, ওরা বিয়ে করুক আর জাহান্নামে যাক, আমরা ওদের নিয়ে এতো মাথা ঘামাচ্ছি কেন ? ওদের ভালমন্দ ওরা বুঝবে………

একজন বাধা দিয়ে বললে—আমাদের চোখের সামনে অন্যায় হ'তে দেবো না। অন্যায় যে করে, অন্যায় যে সহে—দুই-ই পাপ।

সপ্তম জন বললে—এ তো আর সতীত্ব রক্ষা সমিতি নয়। আর যার সতীত্ব আল্‌গা, তাকে বেঁধে আঁটসাঁট করে রাখা মুস্কিল।

অষ্টম জন বললে—বিজয় মার খাওয়াতে পেণ্ডারিয়ার ছেলেরা কিন্তু খুব দমে গেছে।

নবম জন বললে—ওরা যদি ফিরে আমাদের মারে ?

সবাই হেসে উঠ্‌লো। উয়ারীর ছেলেদের মারা যে খুব সহজ নয়, তাদের হাসি শুধু সেই কথাটাই ঘোষণা করলো।

ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ যুব-সম্মেলনের অধিবেশন হ'বে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হ'লো সুবীর। মলয় সেন ও অঞ্জলি সম্মেলনের যুগ্ম সম্পাদক হ'লো। অঞ্জলিকে সব মেয়েরা মানে এবং সব মেয়েরা বিশ্বাস করে, তাই তার সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে হ'লো। মলয় ল' পাশ করে ঢাকায় ওকালতী করছে—অল্প কিছুদিন হ'লো জেল হ'তে মুক্তিলাভ করেছে। মলয়ের অর্গেনিজেশনের ক্ষমতা প্রচুর—মেয়েদের স্কুল, স্বদেশী এক্জিবিশন, কংগ্রেসের মিছিল, হরতাল ইত্যাদি অর্গেনাইজ্ করাতে তার বিশেষ ক্ষমতা আছে।

অঞ্জলির কাজ বেড়ে গেলো। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যকরা, চাঁদা আদায় করা হ'লো সবচেয়ে হাঙ্গামার কাজ। অঞ্জলি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে চাঁদা আদায় করতে লাগলো। অঞ্জলির উৎসাহ সুবীরকে তৃপ্তি দিলো। অঞ্জলির এতটাই খ্যাতি ছিলো যে তাকে কেউ ফিরিয়ে দিতে পারতোনা। সে চাঁদা আদায় করলো সবচেয়ে বেশী।

মলয় একদিন অঞ্জলিকে বললে—আপনার সহযোগিতা না পেলে আমাদের সম্মেলনের যে কি হ'তো, তাই ভাবছি। আপনি যে সব বাড়ী থেকে চাঁদা নিয়ে এসেছেন, তারা জীবনে কোনদিন চাঁদা দেয়নি। সাবজজ্ সমরবাবুর বাড়ী থেকে কি ক'রে চাঁদা আদায় করলেন, তা' আজও আমার কাছে পাজল্ মনে হচ্ছে।

অঞ্জলি হেসে বললে—তা হ'লে বলুন, আপনারা আমার কাছে হার মেনেছেন।

মলয় বললে—হার মানবো বলে ভাবিনি কিন্তু হার মানতে হ'লো।

মলয় কিছুক্ষণ পরে বললে—আপনার মেয়ে-ভলাণ্টিয়ারদের ঠিক রেখেছেন? আর যারা গান গাইবে, তাদের একটু কোচ্ করবেন।

অঞ্জলি বললে—ভলাণ্টিয়ার ঠিক্ হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের পোষাকের কি রং হ'বে। আপনি যে বলেছেন যে সবার পোষাক লাল হ'বে, তাতে অনেকের আপত্তি আছে। লাল পোষাকের সঙ্গে মেয়েরা বল্‌শেভিক্ রাশিয়ার মিল খুঁজে পেয়েছে—গবর্ণমেন্ট অফিসারের মেয়েরা সেই পোষাকে আস্‌তে নারাজ।

মলয় বললে—লাল রং আমি নির্য্যাতিতের এম্‌ব্লেম্ হিসাবে ধরেছিলুম। লাল না হ'লে আপনি কি পোষাকে আস্‌তে বলেন। ভলাণ্টিয়ার পোষাকে একটা ইউনিফর্মিটি থাকা চাই।

অঞ্জলি বললে—গ্রীন্ পোষাক মন্দ হ'বে না—গ্রীন্‌কে যৌবনের এম্‌ব্লেম্ হিসাবে ধরা যায়।

মলয় সম্মতি দিলো। মলয় বললে যে ছেলেদেরও সেই রঙের পোষাক হ'বে।

ওয়ারষ্ট্রীটের মোড়ে অঞ্জলির সঙ্গে রাবেয়ার দেখা হ'লো।

রাবেয়া মুখভার করে বললে—তোমাদের বাসায় যাচ্ছিলেম। তোমার সঙ্গে এখন দেখা পাওয়া তো ভার। যতসব কংগ্রেসের

ছোক্‌রারা এসে বাড়ী ভিড় করে থাকে। তোমাদের বাসাতো কংগ্রেস্ ক্যাম্প্ হ'য়ে উঠ্‌লো। তোমার বাবা কিছু বলেন্ না?

অঞ্জলি সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে—সত্যিই ভাই আজকাল কাজে ভারী ব্যস্ত আছি—তাই সব সময় দেখা হ'য়ে উঠে না। সন্ধ্যার পরে আজ যেয়ো, কথা হ'বে।

রাবেয়া বললে—ওরকম এন্‌গেজমেন্ট্ করে যাওয়া চলে না, সময় মেপে গল্প জমে না।

অঞ্জলি হাস্‌তে হাস্‌তে বললে—ভাই, এই ক'টা দিন। হাতে যখন ভার নিয়েছি, তখন ছিনিমিনি খেলা করে লাভ নেই।

রাবেয়া বললে—সুরমা মাসীর কাছ থেকে তোমার নিন্দে শুনে এলাম। তুমি না-কি তার মেয়েকে গানের কোরাসে নাওনি।

অঞ্জলি হেসে বললে—ঢাকার সব মেয়েকেই তো আর গানের ভিতর নেওয়া চলে না। ওকে ভলান্টিয়ার হ'তে বলেছিলেম, ভলান্টিয়ার উনি হবেন্ না।

রাবেয়া বললে—হ্যাঁ, সুরমা মাসী বলছিলেন যে অঞ্জলি ও শেষকালে দলাদলির ভিতর গেলো। আর যে রকম স্বামী পেয়েছে, সে-রকমই তো হ'বে।

অঞ্জলির মুখের ভাব বদ্‌লে গেলো, সে কঠিনভাবে বললে—রাবেয়া, তুই ও কি তাই বিশ্বাস করিস্?

রাবেয়া বললে—পাগল, সুরমা মাসীকে তো জানিস্‌ই, তিনি ভাবেন তার মেয়ের মত গুণী আর কেউ নেই।

সেবার সুনীলা ফেল করলে, সুরমা মাসী বলে বেড়াতে লাগলেন যে একৃজামিনারের সঙ্গে ঝগড়া ছিলো বলে সুনীলাকে ফেল করে দিয়েছে।

কথা বলতে বলতে দুজনেই রেলওয়ে লাইনের পাশে এসে উপস্থিত হ'লো। হাটখোলা রোড্ দেখে রাবেয়া বললে—নীরেনবাবুর কাছে যাবি ?

অঞ্জলি বললে—তুই যা, আমার জরুরী কাজ আছে।

রাবেয়া হেসে চলে গেল—নীরেনের কাছে যাবে কি না, কিছু বলে গেলোনা।

সম্মেলনের দিন অঞ্জলির কাজের অন্ত নেই। ভোর বেলা স্নান সেরে সে বেরিয়েছে—তার দেখতে হ'বে মেয়ে ভলান্টিয়ারেরা যাতে আসে এবং কোরাস গানে যাদের নেওয়া হয়েছে, তারা বিলম্ব না করে। মফঃস্বল হ'তে যে সব নারী-ডেলিগেট্ এসেছেন, তাদের বন্দোবস্তও দেখতে হ'বে, অভিযোগ শোনতে হ'বে এবং ত্রুটি সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করতে হ'বে। মলয় অঞ্জলিকে একখানা মোটর জোগাড় করে দিয়েছে—সেই মোটর নিয়ে অঞ্জলি গত দু'দিন যাবৎ চলা-ফেরা করছে।

এদিকে মলয়ের হয়েছে মুস্কিল। সম্মেলনের সাব্জেক্টস্ কমিটিতে মলয় সোস্তালিজমের বিরুদ্ধে মতবাদ দিয়েছে বলে ভলান্টিয়ারের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। ভলান্টিয়ারগণের সন্দেহ হয়েছে যে মলয় জেল থেকে এসে এ্যারিষ্টোক্রেটের

দলে মিশে গেছে। ভলাণ্টিয়ার দলে ভাঙন্ ধরবার আশঙ্কা জেনে খবর প্রচার করে দিয়েছে যে কন্‌ফারেন্সে সে সোস্তালিজমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেবে না।

কন্‌ফারেন্স আরম্ভ একটায়। সবেমাত্র মেয়ের দল উদ্বোধন সঙ্গীত আরম্ভ করেছে—এমন সময় বাইরে গণ্ডগোল পড়ে গেলো, প্রথম শোনা গেলো যে ছেলেভলাণ্টিয়ারদের মধ্যে মারামারি লেগেছে। প্যাণ্ডেলের ভিতরে যে সব ভলাণ্টিয়ার ছিলো, তারাও বাইরে এসে মারামারিতে যোগ দিলো। দু'চার জন জখম হ'লো —কন্‌ফারেন্স ভেঙে গেলো; অনেকে বাইরে এসে মারামারি থামাতে চেষ্টা করলেন। প্রথমটা কেউ থামাতে পারলেন না। মারামারির হেতুটা কেউ তখন জানতে পারেনি। তারপর বহু লোক মাঝখানে এসে পড়াতে মারামারি থামলো।

সেদিনকার জন্য কন্‌ফারেন্স বন্ধ হয়ে গেলো, তারপর শোনা গেলো যে এক স্বরাজ সঙ্ঘের ছেলে নবীনসঙ্ঘের ছেলেকে বিদ্রূপ করেছিলো—তাতে সুপ্ত উয়ারী-গেণ্ডারিয়া বিরুদ্ধতা জেগে উঠেছিলো। দু'দলের খুন্ চেপে গেলো; দু'দলই মারামারি শুরু করে দিলে।

তারপরদিন ভয়ে ভয়ে কন্‌ফারেন্সের কার্য্য সমাধা হয়ে গেলো। সবাই যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। অঞ্জলি পণ করলো যে আর সে এসব হাঙ্গামার কাজে হাত দেবে না। অঞ্জলি যে সব ঘরের মেয়েদের ভলাণ্টিয়ার করেছিলো—অনেক পরিবার থেকে তার গঞ্জনা সইতে হয়েছিলো। সে প্রত্যুত্তরে কিছুই বলতে পারেনি।

যৌবনশক্তি দুর্দান্ততার কোঠায় গিয়ে যখন পৌছে, তখন তার জয় সাফাই গেয়ে অঞ্জলি নিজেকে ছোট করতে চাইলোনা। অঞ্জলি ভলান্টিয়ারদের অসহনশীলতা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারলেনা। ভলান্টিয়ারগণের মধ্যে সেন্স অব্ হিউমারের অভাব দেখে অঞ্জলি সত্যিই ব্যথিত হ'লো, এত বড় একটা কন্‌ফারেন্সের দিনে তারা প্রাচীন গৃহবিবাদ ভুলতে পারলোনা—অন্ততঃ ভুলতে চেষ্টা করলো না, বরঞ্চ এই দিনের সুযোগের জন্যই যেন তারা অপেক্ষা করছিলো। অথচ অঞ্জলি জানে যে এসব সঙ্ঘের ছেলেদের মধ্যে এমন সব ছেলে আছে যারা যে-কোন দেশের পক্ষে গৌরব। তাদের মহত্ব অঞ্জলি জানে—এবং জানে বলেই অঞ্জলি তাদের অন্যায় দেখে এতো ব্যথা পায়।

মলয়ের সঙ্গে একদিন দেখা হওয়াতে অঞ্জলি বললে—আপনার ছেলেদের ডিসিপ্লিনের বড় অভাব।

মলয় বললে—এরা ডিসিপ্লিনকে নিন্দার চোখে দেখে। এরা বলে যে প্রাণ থাকলেই স্পন্দন থাকবে। এই খুন্‌জখম্ না-কি ওদের প্রাণের সজীবতা প্রকাশ করে।

অঞ্জলি হেসে বললে—তা হ'লে বলুন, গুণ্ডারাই সবচেয়ে প্রাণবন্ত জীব।

মলয় বললে—সে ভুল করবেন না। এরা যে-মুহূর্তে বিবাদ করে, পরমুহূর্ত্তেই বিবাদ ভোলে। এরা মারামারি করে, কিন্তু হীন নয়। আজ যার মাথা ফাটিয়েছে, তারই জন্য ওরা নিজেদের প্রাণ দিতে পারে। এদের চল্‌বার সড়ক্ আলাদা।

অঞ্জলি সলজ্জভাবে বললে—আমি জানি এদের মহত্ব, তাই এদের গুণ্ডামি আমি বরদাস্ত করতে পারিনে।

মলয় বললে—এদের মনের কথা এরা চেপে রাখতে পারে না। এরা ব্যথা পেলে আঘাত করে, মতের অনৈক্য সইতে পারেনা। কিন্তু এদের প্রাণে আছে দরদ—তাই এরা প্রাণ দিয়ে দেশকে সেবা করতে পারে। এরা নিজেকে কোনদিন বড় চোখে দেখে না, নিজেকে বড় করার জন্ত কোন দিন হীনবৃত্তি অবলম্বন করবেনা। এদের নিঃস্বার্থতা আমাকে মুগ্ধ করে, তাই এদের অসহনশীলতা আমি ক্ষমা করি। এরা ভদ্র নয়, এরা শিষ্ট নয়, কিন্তু এরা মানুষ। মানুষ হিসাবে এরা অনেকের চেয়ে বড়ো। এদের ভদ্রতার রীতি আলাদা—তাই এদের সঙ্গে না থাকলে এদের চে[illegible] যায় না।

অঞ্জলি বললে—আমি জানি যে ওরাই দেশকে গড়ে তোলবে, অথচ ওদের ভুল বুঝে কতই না ওদের আঘা[illegible]য়েছি, ওদের প্রতি অন্যায় করেছি।

মলয় হেসে বললে—এদের মেজাজের অ[illegible] থই পাইনে। এরা কাকে অন্যায় বলবে, কোনটাকে ন্[illegible] ভাববে, কিছুই বলা যায় না। কিন্তু এরা অন্যায়ের সঙ্গে সন্ধি করবেনা। এদের ব্যবহারে সংযমের অভাব, তাই এদেরকে এতো ভুল বুঝি।

অঞ্জলি শঙ্কিতচিত্তে ভাবতে লাগলো যদি এই ছেলেদের সংযম-হীন ব্যবহার, শিষ্টতা-হীন আচরণ, ও রীতি-হীন বাচনতা কোন দিন উচ্ছৃঙ্খলতার কোঠায় গিয়ে পৌছায়। সেই অশুভদিন কি দুর্যোগেরই না সৃষ্টি করবে।

এই সম্মেলনের হুজুগে অঞ্জলি সাতদিন পরিশ্রম করেছে। সুবীরের সঙ্গ সে একদম পায়নি—চাইবার মতও তার সময় ছিলোনা। সম্মেলনের হুজুগ যখন কেটে গেলো, তখন তার মনে হ'লো যে এই দিনগুলি একেবারে বৃথা কেটেছে। তার মনে হ'লো যে মানুষের এই ছোটাছুটি, এই স্বেচ্ছাকৃত হাঙ্গামা কেন—এই নিরর্থক দলাদলি কেন? এর চেয়ে ভালো—ঢের ভালো ম্যাকিন ষ্ট্রীটে দ্বিতল কক্ষে বসে সুবীরের সম্বন্ধে চিন্তা, সুবীরের সঙ্গে কথা বলা, সুবীরের সান্নিধ্য নিবিড়তর করা। অঞ্জলির হঠাৎ মনে হ'লো যে এই বিশ্বের অন্তহীন কর্ম্মস্রোতে ভাসমান থাকার প্রচেষ্টা শুধু শক্তির অপব্যয়—তার চেয়ে ভালো পারে বসে কর্ম্মহীন দিবসের অলসমুহূর্ত্তগুলিকে তন্দ্রাহীন স্বপ্নের জড়িমা দিয়ে ভারাক্রান্ত করে নেওয়া। অঞ্জলি মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেলো যে সুবীর একা পারাবারের নৌকা স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে—নৌকা স্রোতে দুল্‌তে দুল্‌তে এগিয়ে চলেছে। অঞ্জলির সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো—তার বুক কাঁপতে লাগলো; সে যে সুবীরকে ছেড়ে সমুদ্র পার হ'তে পারবেনা—পার হ'তে চায় না।

এই কিছুদিন আগে অঞ্জলি কারুর সঙ্গ চায়নি—আজ সুবীরের সঙ্গ না পেলে মনে হয় সমস্ত কাজ অর্থহীন। আজ তার মনে হলো নারী পুরুষের সঙ্গ বাদ দিয়ে কি করে চলে—আর সেই চলার নামই বা কি, সুখই বা কোথায়। অঞ্জলি

স্বাবলম্বনে বিশ্বাস করে এসেছে, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচার করে এসেছে—আজ সে প্রাণে প্রাণে যেন বুঝতে পারলো যে নারীর জীবন অবলম্বনেই বিকাশ, অধীনতায় তার প্রকৃত সত্ত্বা। যে নারী পুরুষকে বাদ দিয়ে চলতে চায়, সে অভিশপ্ত—যে নারী পুরুষকে বাদ দিয়ে চলেছে, সে ঠকেছে—যে নারী পুরুষকে বাদ দিয়ে চলবে, সে হারবে। মনের মধ্যে তর্কের তুফান যতদিন ছিলো, অঞ্জলি এ সত্য অস্বীকার করেছে, কিন্তু আজ অনুভূতির সঙ্গে সে এই সত্য পেয়েছে যে নারীকে পুরুষের পাশে আসতেই হ'বে। এতে নারীত্বের হয়তো অপমান হ'বে, হোক্; কিন্তু জীবনের প্রতি কাজ, প্রতি মুহূর্ত্ত সঙ্গীতময় হ'য়ে উঠবে।

বিয়ে ক'রে অঞ্জলি এই কথাটা বহুদিন ভেবেছে যে যারা বিয়ে করেনি—তাদের হতভাগ্য দিনগুলির সঞ্চয় কোথায়? মানুষ পরিপূর্ণ হয় গ্রহণে। অবিবাহিত জীবনবেদে গ্রহণ হ'লো মহা-পাপ। জীবনে যারা ধনী, তারাই গ্রহণ করতে জানে, তারাই জীবনে সঞ্চয় করতে পারে। জীবনে যারা কৃপণ, তারা শুধু অস্বীকার করেই গেলো। অবিবাহিত জীবন হ'লো কৃপণের জীবন।

অঞ্জলি আজ ভরে উঠেছে—মনে ও দেহে। কাণায় কাণায় সে ভরে উঠেছে—সুধীরের সঙ্গ পেয়ে তার যৌবনের উচ্ছলতা বেড়েছে। অঞ্জলি যখন চলে, তার সমস্ত দেহ দুলে উঠে—সে কিছুতেই নিজেকে সংযত করে রাখতে পারে না। অঞ্জলি যখন কথা বলতে থাকে, সে হঠাৎ থেমে যায়—মনে হয় তার কণ্ঠে

সুরের রেশ পাওয়া যায়। অঞ্জলি নিজের হাসির শব্দে চমকে উঠে—মনে হয় এ হাসিতো তার ছিলো না। অঞ্জলি ভাবে—তার হ'লো কি। অঞ্জলি ভাবে, আর হাসে। বিয়ের আগে কত পণই না মনে মনে ছিলো, কত অহঙ্কারই না প্রাণে ছিলো। আজ সব ভেসে গেছে—ভেসে গেছে বলে আজ তার মনে স্বস্তি, প্রাণে শান্তি—ভেসে যাক্ বলে আজ তার প্রার্থনা। অঞ্জলি ভাবে তার নতুন জীবনের কথা—তার প্রাণমন পুলকে শিউরে উঠে। হায় নারী, তুমি তোমার নারীত্বের কথা বলে অহঙ্কার করো; অথচ পুরুষকে পেলে তুমি তোমার নারীকে কখনও স্মরণে রেখেছো? এইটুকু নিয়ে এতো দর্প!

অঞ্জলির হাসি পেলো—কিন্তু নারীত্বের বিসর্জ্জনে নিজের উপর ধিক্কার এলো না।

অঞ্জলি তার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে এমনি কত কথাই না ভাবতে লাগলো—যে কথা ভাবতে আগে ঘৃণায় শিউরে উঠতো, আজ তা' ভাবতে গিয়ে আনন্দে কেঁপে উঠলো।

সুবীর হঠাৎ ঘরে ঢুকেই ডাকলো—অঞ্জলি।

অঞ্জলি সুবীরকে দেখে তাকে স্পর্শ করে বললে—বলো, তুমি আমায় কোনদিন ছেড়ে যাবে না।

সুবীরের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেলো, সে অঞ্জলির গাল দুটো টিপে একটি ছোট চুমো দিলো—অঞ্জলি লাল হয়ে উঠলো। তখন সূর্য্যাস্তের শেষ আভা জানালা দিয়ে অঞ্জলির মুখের উপর মায়াজাল বিস্তার করলো। সুবীরের সমস্ত দেহটা ঝিম্ ঝিম্

করে উঠলো, প্রতি শিরা-উপশিরাগুলি শির্ শির্ করে উঠলো, বুক আনন্দে দুলে উঠলো।

অঞ্জলি অভিযোগের সুরে বললে—তুমি আমাকে কোনদিন বেড়াতে নিয়ে যাওনা। আচ্ছা, এই সন্ধ্যাবেলা ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করে?

সুধীর হেসে বললে—কেন, তুমি বেড়াওনা বলে কি কোন দুঃখ আছে না-কি। কতদিন আমি তোমাকে বেড়াতে নিয়ে গেছি।

অঞ্জলি বালিকার মত অভিমান সুরে বললে—ইস্, আমি বলেছি, তাই আমাকে নিয়ে গেছো। তুমি তো কোনদিন নিজের ইচ্ছায় আমাকে বেড়াতে যেতে বলোনি।

সুধীর বললে—নিজে হয়ত বলিনি, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় বেড়াতে নিয়েতো গেছি। আর তোমাকে বেড়াতে আমিতো কোনদিন বাধা দিই নি।

অঞ্জলি বললে—ছাই, আমি কি বাধা দেবার কথা বলছি। কিন্তু তুমি যদি তোমার ইচ্ছা প্রথমে জানাও আমার কেমন ভালো লাগে। আমিই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিই—তুমি নিজের তরফ্ থেকে কোন ইচ্ছাই জ্ঞাপন করোনা, অথচ তোমার ইচ্ছা জানতে পেলে আমার ভালো লাগে, তোমার ইচ্ছা পালন করবার সুযোগ পেলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

সুধীর নিরুপায় ভাবে বললে—তোমার ইচ্ছাতেই যে আমার

ইচ্ছা শেষ হয়ে যায়। তোমার অভিলাষ জানতে পারলে আমি যে আমার অভিলাষের কথা ভুলে যাই। আমি নিজে কোন দিন জানাইনি—কারণ জানাবার দরকার বোধ করিনি।

অঞ্জলি সুবীরের হাত ছেড়ে দিয়ে বলে উঠলো—তোমরা জানালে যে আমরা খুসী হই বেশী। যে কাজ আমি করবো, সে কাজের তাড়া যদি তোমার কাছ থেকে আসে, আমার যে কত ভালোলাগে, তা' তুমি বোঝনা। বোঝলে তুমি তোমার সখ জানাতে কার্পণ্য করতে না। আমি যে চাই তোমার ইচ্ছার ভেলাতে ভেসে বেড়াতে। আমার মনে হয়, তুমি তোমার রাশ টেনে চল—তোমার সেই সংযম আমার ভালো লাগে না।

সুবীর হেসে বললে—তোমরা সংযম-হীন উচ্ছৃঙ্খল লোক পছন্দ কর, এ কথা আমি জানতেম না। আমি আমার ইচ্ছাকে দমন করেছি সত্য, কিন্তু সে শুধু তোমার ইচ্ছাকে স্থান দেবার জন্য।

অঞ্জলি বললে—আমি কি পছন্দ করি, এখন বলতে পারব না, কিন্তু যা ভাল লাগে, তাই শুধু জানালেম।

সুবীর যে কথা বলতে এসেছিলো, সে কথা তার বলা হয়নি; বলতে তার যেন ইচ্ছে হচ্ছে না, অথচ বলতে হ'বে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুবীর বললে—কাল আমি বিক্রমপুরের সমস্ত গ্রামে কংগ্রেসের কাজ দেখতে বেরিয়ে পড়বো—প্রায় পনর দিন বাইরে থাকতে হবে।

অঞ্জলির মনটা ছ্যাঁক করে উঠলো। অঞ্জলি একটু অন্যমনস্ক ভাবে বললে—না গেলে হয় না। আমি যেতে দেবোনা, আমার যেতে দিতে ইচ্ছে নেই।

সুবীর বললে—আমি যে কথা দিয়েছি, অঞ্জলি। আমার যে যেতেই হ'বে। আর পনর দিনেরতো ব্যাপার—এ-তো দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যাবে।

দিনগুলি যারা ক্যালেণ্ডার দিয়ে দেখে, সময়ের পরিধি দিয়ে বিচার করে, তাদের দিন কাটে, কিন্তু অঞ্জলির কাছে দিনগুলি ক্যালেণ্ডারের অনেক উর্দ্ধে, সময়ের নাগালের বাইরে—তার কাছে প্রতিদিনের মিলন ক্ষণিক মনে হয়, অথচ প্রতি মুহূর্ত্তের বিরহ অন্তহীন বলে প্রতিভাত হয়। পনর দিনের সান্নিধ্যে তার অতৃপ্তি ঘোচেনা বটে কিন্তু একদিনও সে হারাতে রাজী নয়। পনর দিনের কথা শুনে অঞ্জলির মুখখানা ব্যাথায় বিবর্ণ হয়ে গেলো।

অঞ্জলি ধীরে ধীরে বললে—তুমিতো যাবে কাজে কিন্তু আমার জন্যে কি রেখে যাবে। তুমি তোমার পনর দিনের কথা ভাবলে, কিন্তু আমার পনর দিন নিয়ে আমি কি করব।

সুবীর এতোটা ভাবেনি—অঞ্জলির পনর দিনের কথা সত্যি তার মনে আসেনি। যে-অঞ্জলি বাবা-মা'র কাছে জীবনের বিশবৎসর সুখে শান্তিতে কাটিয়ে দিয়েছে, তার আর পনর দিন সুবীরকে বাদ দিয়ে কাটবেনা, একথা সুবীর ভাবতে পারেনি এবং ভাবতে পারেনি বলেই সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তার মনে উঠেনি।

অঞ্জলির কথার সে অনেক ভাবেই উত্তর দিতে পারতো কিন্তু অঞ্জলির সেন্টিমেন্ট্‌কে সে আঘাত দিতে চাইলোনা। সুধীর চুপ করে রইলো—তার মনে হ'লো যে, সে যে-কথাই বলবে, তা-ই রূঢ় শোনাবে।

অঞ্জলি চোখ চেয়ে বললে—তুমি একাই যাবে? না, আর কেউ সঙ্গে যাবে।

সুধীর বললে—মলয় ও তার বোন প্রণতি সঙ্গে যাবে।

অঞ্জলি চট্‌ করে বলে ফেললে—কেন, প্রণতির যাবার কি দরকার?

কথার ভিতর উত্তেজনা ছিলো—প্রকাশ হওয়াতে অঞ্জলি যেন একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে গেলো।

সুধীর বললে—প্রণতিকে সঙ্গে নিলে মেয়েদের মধ্যে কাজের সুবিধে হ'বে।

অঞ্জলি সংযতভাবে বললে—প্রণতিকে দিয়ে কংগ্রেসের কাজ সুবিধে হয়, একথা তুমি বিশ্বাস করো?

সুধীর সোৎসাহে—বললে—হ্যা, সুবিধে হয় বই কি? প্রণতি ছেলে-মেয়েদের কাছে খুব প্রিয়, তার কাজ করবার উৎসাহ ও উদ্যম সত্যিই প্রশংসার জিনিস। তাকে আমি দেখেছি গ্রামে গ্রামে একা নারী-সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে।

অঞ্জলির কথা বলবার উৎসাহ চলে গেলো। প্রণতি রাজার দেউড়ীর মেয়ে—সে যখন স্কুলে পড়তো, তার বাপ তাকে বোর্ডিংএ পাঠিয়েছিলো, কারণ একদিন রাত্রে প্রণতি

তার মামাত ভায়ের সঙ্গে তালতলায় ষ্টীমার ঘাটে চলে এসেছিলো বরিশালে পালিয়ে যাবার জন্যে। টের পেয়ে মলয় ষ্টীমার ঘাট থেকে নিয়ে আসে। বোর্ডিংএ তাকে বেশীদিন রাখতে পারা যায়নি কারণ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিষেধ সত্বেও সে স্কুল-কম্পাউণ্ডের উত্তর দিকের নীচু দেওয়ালের সম্মুখে গিয়ে পথের যুবকদের সঙ্গে আলাপ করতো।

প্রণতির বাপ-মা মারা গেছেন—আজ সে কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেসের কাজে নেবেছে। অঞ্জলি প্রণতির সব কথা জানতো। অঞ্জলি জানে যে প্রণতি কংগ্রেস ভলান্টিয়ারদের কাছে প্রিয় কেন—অঞ্জলি একথাও জানে যে কংগ্রেসে প্রণতি থাকলে কেন ছেলে-ভলান্টিয়ার সংগ্রহে সুবিধে হয়। এসব কথা জানে বলেই অঞ্জলির কথা বলবার উৎসাহ চলে গেলো।

একবার অঞ্জলির মনে হ'লো যে সে সুবীরকে নিষেধ করে দেবে, সুবীরকে সাবধান করে দেবে। পরক্ষণেই সে কথা বলতে তার ঘৃণা বোধ হ'লো। প্রণতি যদি সুবীরকে অঞ্জলির কাছ থেকে টেনে নিয়ে যেতে পারে—প্রণতির জয় হোক্। অঞ্জলি প্রণতির চেষ্টাকে বিধ্বস্ত করবার জন্য এক কণাও চেষ্টা করবে না। ক্ষণে ক্ষণে অঞ্জলির মনে হ'তে লাগলো যে সুবীরের হয়তো প্রণতির প্রতি একটু নজর আছে—বারবার সে মন হতে সে-কথা তাড়াতে চেষ্টা করলো। অঞ্জলি ভাবলে যদি প্রণতি ফাঁদ পাতে—যদি সুবীরের নির্দোষ মন ভুল করে সেই ফাঁদে পড়ে যায়। হয়তো তার কঠিন ভাবে

সাবধান করে দেওয়া ভাল—হয়তো প্রণতির সঙ্গে বিক্রমপুরে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু অঞ্জলির রুচি ও শিক্ষা বারবার তাকে আঘাত করে বলে দিয়ে গেলো যে অঞ্জলি প্রেমের পাশা খেলায় হারতে প্রস্তুত কিন্তু প্রণতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সে যোগ দিতে প্রস্তুত নয়। সুবীরকে অঞ্জলি জানে বলে তার মনে আছে বিশ্বাস—প্রণতিকে জানে বলে তার মনে আছে ভয়; এই বিশ্বাস ও ভয়ের সংঘাতে অঞ্জলির মনে অনেক কিছু সংকীর্ণ কথা এসে ভিড় করলো—কিন্তু একটা কথাকেও সে বেরুবার পথ দিলো না। লজ্জায় সে সঙ্কুচিত হ'য়ে গেলো, রাগে সে কঠিন ভাব ধারণ করলো, অভিমানে সে গম্ভীর হ'য়ে গেলো।

অঞ্জলি জানে যে জীবন-খেলায় অভিমান করে বসে থাকলে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। তার বাঁচতে হ'লে, তাকে জিততে হবে; এবং তাকে জিততে হ'লে, তাকে খেলোয়াড় হ'তে হ'বে। তবুও যে সাবধানের বাণী তার হৃদয় মথিত করে জেগে উঠেছিলো, সে-বাণী অনুচ্চারিত রয়ে গেলো। "প্রণতিকে সঙ্গে করে যেয়ো না"—"তার সঙ্গে তোমায় যেতে দিতে আমার ভাল লাগে না", এই কথার ভিতর যে ইঙ্গিত যে ভয় ব্যঞ্জনা লুক্কায়িত রয়েছে, অঞ্জলির শিক্ষিত অন্তঃকরণ সে কথা সুবীরের কাছে বলতে গিয়ে একেবারে কুঁচকে গেলো।

অঞ্জলি শুধু অলস ভাবে বললে—যা—ও, কিন্তু যতো শীঘ্র পারো, এসো।

৭

অঞ্জলি জীবনের ঘোড়দৌড়ে যে-ষ্টেক্ করলো, সুবীর তার কিছু আভাসই পেলো না। অঞ্জলির সম্মতি এতো সহজে পেয়ে, সুবীর তাকে জড়িয়ে ধরলো; অঞ্জলি কঠিনভাবে সুবীরের সুকোমল আলিঙ্গনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইলো। দুজনের বুক দুরুদুরু করে কেঁপে উঠলো—সুবীরের বুক আনন্দে, অঞ্জলির বুক আশঙ্কায়।

বিজয়ের দিনগুলো ক্রমশই ভারি বোধ হতে লাগলো। এতোদিন তার দিনগুলো তারই চোখের সামনে ভেসে ভেসে চলে যেতো—সে আটকে রাখতে পারতো না। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তো—মোড়ে মোড়ে চায়ের দোকানে আড্ডা দিতো, মেয়ে-স্কুলের গাড়ী দেখতে দেখতে বন্ধুদের বাড়ী গিয়ে গানের আড্ডা বসাতো। দুপুরে ইউনিভার্সিটি—সন্ধ্যায় আড্ডা অথবা রাবেয়াদের বাড়ী। পাড়ার ছেলেরা নতুন অভিনয়ের বন্দোবস্ত করলে বিজয়ের উপর গান শেখাবার ভার পড়তো। মেয়ে মহলে তার খাতির ছিল—কথার ইঙ্গিতে, চোখের ইসারায়, মুখটেপা হাসির বাণে তার জীবনের মুহূর্তগুলো দৌড়ে চলে যেতে লাগলো। পথে হয়তো সে হোঁচট খেয়েছে—কিন্তু তার আঘাত লাগেনি। বিজয়ের হঠাৎ মনে হ'ল যে তার জীবন আকাশের স্নিগ্ধ নীলিমা চলে গেছে, সময় এগুতে চায় না—সে স্থাণু হয়ে বসে পড়তে চায়। তার আড্ডাতে ভাল লাগে না, বাইক্ নিয়ে পল্টন মাঠে বেড়াতে যায় না, লোককে গান শেখাতে তার উৎসাহ নিভে যায়। সে যেন রাবেয়ার মায়াজালে আটক্ পড়ে গেছে।

রাবেয়া মায়াজাল বিস্তার করেছে কি-না, সে জানে না; কিন্তু সে আটক পড়ে গেছে নিজের রচিত মায়াজালে। কল্পনায়

সোনালি রঙ মনের উত্তাপে গলে গলে যে-মালা রচনা করেছে, আজ সে মালা তার হাত জুড়ে বসে আছে। সে রাবেয়াকে সাজাতে চায় সেই মালাতে, রাবেয়াকে পেতে চায় তার মালার বেষ্টনে। বিজয়ের মনে হ'লো যে সে রাবেয়ার হাসি চোখ বুজে থাকলেই শুনতে পায়। মাঝে মাঝে তার মনশ্চক্ষে সে দেখে যে রাবেয়া অঞ্জলি ভরে অর্ঘ্যদিতে এসেছে, বিজয় গ্রহণ করতে সঙ্কোচ বোধ করছে। বিজয় অস্থির হয়ে উঠলো। সে সন্ধ্যা-বেলার জন্ম সারাক্ষণ কোনরকমে কাটাতো—অথচ সন্ধ্যা হ'লে রাবেয়ার বাড়ীতে যেতে তার পা কেঁপে উঠ্‌তো।

হঠাৎ এ কি তার হ'ল!

মনীষা বলে—দাদা, তুমি আজকাল বাইরে বেরোও না কেন?

বিজয় বলে—ভাল লাগে না।

মনীষা বিশ্বাস করতে পারে না—বাইরে যাওয়া বিজয়ের ভাল লাগে না! একথা বিশ্বাস করা মনীষার পক্ষে সুকঠিন। মনীষার মন আশঙ্কায় ভরে ওঠে, ভাবে যে রাবেয়ার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কি-না।

মনীষা তবুও বলে—রাবেয়ার সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিলো।

বিজয় শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, ঠোঁটের কাছে প্রশ্ন আসে—আমার কথা কিছু বলেছিল? বলা হয় না—অনুচ্চারিত বাণী অস্পষ্টতার রহস্যে মিলিয়ে যায়।

মনীষার আর কিছু বলতে সাহস হয় না, অথচ মনীষা আরও কিছু বললে বিজয় খুশী হ'তো।

আজ সন্ধ্যায় বিজয় আর বাসায় থাকতে পারলো না।

বাইক্‌টি হাতে ক'রে সে বেরিয়ে পড়লো। "লোহার পুলের" সামনে সে একটি মোসলমানের উপর গিয়ে প্রায় পড়ছিলো, এমন সময় ব্রেক্‌ কসাতে আরোহী ও পথিক উভয়েই বেঁচে গেলো। বিজয় দুঃখ প্রকাশ করলো—দাজার ভয়ে নয়, কিন্তু তার যেন মনে হলো যে সে অন্যায় করেছে। ফরাসগঞ্জ পার হ'য়ে নর্থ ব্রুক হলের পাশ দিয়ে বাজলাবাজারের ভিতর দিয়ে হঠাৎ জেনারেল পোষ্টাফিসের সামনে এসে এক কুলীর উপর বিজয় অযথা পড়ে গেলো। বিজয়ের আঘাত লাগেনি—শুধু হাতের কনুই একটু খানি কেটে গেছলো। বিজয় পাশে এক বন্ধুর দোকানে সাইকেলটি রেখে রাবেয়াদের বাড়ীর দিকে রওনা হ'লো। সে চললো পায়ে হেঁটে—পথে পথে বন্ধুর আড্ডা এড়িয়ে এড়িয়ে সে চললো। জনসন রোডের এক চায়ের দোকান থেকে তার এক বন্ধু তারস্বরে ডেকে উঠেছিলো—বিজয় না শুনি না-শুনি ক'রে চলে গেলো। এতো হাঙ্গামা ক'রে সে যখন রাবেয়াদের বাড়ী গিয়ে পৌঁছলো—তখন রাবেয়া বাড়ী ছিলো না। জিজ্ঞাসা করে জানলো যে রাবেয়া নীরেনের সঙ্গে আরমানি টোলার বারোকোণে চলে গেছে।

রাবেয়ার পড়ার ঘরে বিজয় গিয়ে বসলো। আজ অপেক্ষা করে রাবেয়ার সঙ্গে একটা হেস্ত-নেস্ত করে যাবে কিন্তু কি বিষয়ে সে মীমাংসা করবে, তার ধারণা তখনো মনে অস্পষ্টই রয়ে গেলো। টেবিলের উপর "ফরওয়ার্ড" কাগজ ছিলো, বিজয় তার স্পোর্টিং সংবাদ পড়তে লাগলো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে রাবেয়া টক্‌টক্‌ করে দৌড়িয়ে উপরের পড়ার ঘরে এসে দেখে বিজয়কে। নীরেন গেট্‌ হ'তে বিদায় গ্রহণ করে চলে গেছে।

রাবেয়া ঘরে ঢুকেই বললো—বিজয়দা যে!

বিজয় চম্‌কে উঠলো। রাবেয়াকে দেখে আজ আর বিজয় চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলেনা। ফ্রেঞ্চ ক্রেপের সাড়ী রাবেয়ার দেহকে এমন লোভাতুরের মত ঘিরে রয়েছে যে বিজয় যেন রাবেয়ার দেহের সমস্ত সৌষ্ঠভকে অনুভব করতে পারলো। বিজয়ের ইচ্ছা হ'লো যে সে রাবেয়াকে জড়িয়ে ধরে বলে—আমি এসেছি। কিন্তু নিজেকে সাম্‌লাবার জন্য তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট্‌ জ্বালালো। বিজয়ের কপালটা ঘেমে উঠলো।

রাবেয়া তার শিকারী চোখের দৃষ্টি হেনে বললে—কি বিজয়দা, আমাদের সঙ্গে কি কথাই বলবেনা! আমরা কি এমনি ভেসে এসেছি!

এই বলে সামনের দেয়ালে যে ফুল-সাইজ আয়না বসানো ছিল, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আয়নার সামনে ঘরের আলোতে রাবেয়া ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো।

বিজয়ের হাতের সিগারেট্‌টা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো।

রাবেয়া এগিয়ে এসে বিজয়ের সম্মুখস্থিত টেবিলে বসে বিজয়ের চেয়ারের হাতলে হাত রেখে ঝুঁকে পরে বললে—রাগ করেছো?

রাবেয়ার দু'এক গাছা চুল বিজয়ের মুখে এসে লাগলো।

রাবেয়ার নিঃশ্বাসে বিজয়ের সমস্ত শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগলো।

ক্ষণপরেই রাবেয়া শিশুর মত উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো—জানো বিজয়দা, আমাদের আইভির বিয়ে। কলকাতার ব্যারিষ্টার মিঃ গুপ্তের সঙ্গে। আইভির অহঙ্কার এতোদিনে ভাঙলো—ওর যা' দেমাক্ ছিলো। যাক্, বিয়ে করলে যদি একটু নরম হয়।

বিজয়ের মনে হ'লো যে সব মেয়েরাই বিয়ে করছে, শুধু রাবেয়া কেন বসে আছে!

বিজয় চোখ চেয়ে বললে—আচ্ছা রাবেয়া, তুমি কেন বিয়ে করোনা।

বিজয়ের চোখদুটো লাল হয়ে গেছে।

রাবেয়া দুষ্টুমির হাসি হেসে একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—আমাদের দিকে কি ভাই কারোর নজর পড়বে! আমাদের দেখে কি কারোর মন উঠবে!

বিজয় হঠাৎ রাবেয়ার ডান হাতখানি ধরে বললে—রাবেয়া, আমি যে তোমাকে চাই! তোমাকে ছাড়া যে আমার চলবে না, রাবেয়া!

রাবেয়া কোমলকণ্ঠে বললে—বিজয়দা, আপনার চাওয়াতে আমি বাধা দেব, এ বিশ্বাস আপনার কেন হ'লো! আমার এই দেহের দেউলে আপনার উৎসবের তো কোন বাধা নেই।

বিজয়ের চোখ দুটো জল্ জল্ করে উঠলো। বিজয়

বললে—কোন বাধা নেই, একি সত্যি, রাবেয়া!

রাবেয়া তেমনি কোমলকণ্ঠে বললে—দেহের সাঁকো পার হয়ে তোমার কাছে যেতে পারবো, এ তো আমার সৌভাগ্য! বিজয়দা, তুমি তো জানোনা যে আমি কতদিন প্রার্থনা করেছি তোমার একটু স্পর্শ—তুমি কৃপণের মত নিজেকে সঙ্কুচিত করে নিয়েছো। আমি কতদিন তোমাকে চেয়েছি, তুমি অস্বীকার করে এগিয়ে চলেছো। আমি কি ছাই চাই তোমার ঐ কুণ্ঠিত ব্যবহার! আমার এই দেহকে তুমি খান্ খান্ করে ফেলো, আমার সর্ব্বস্ব তুমি অপহরণ করো—আমি তো তা-ই চাই! আমি যে নিজে দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছি, আমাকে লুণ্ঠন করে নেও, বিজয়দা!

এতোগুলি কথা বলে রাবেয়া ক্লান্ত হয়ে বিজয়ের দিকে ঝুঁকে পড়লো—বিজয় রাবেয়ার হাতখানা আরও জোড় করে চেপে ধরলো।

বিজয় বললে—লুণ্ঠন করবার সাহস তো তুমি দেওনি! সর্ব্বদাই ভয় হয়েছে পাছে তুমি সাবধানী হয়ে যাও। তাই তস্করের মত নিজেকে গোপনে রেখেছি—দস্যুতার পুচ্ছ দিয়ে তোমার জীবনকে লণ্ডভণ্ড করতে সাহস করিনি।

বিজয় আজ বেপরওয়া হয়ে গেছে—সাহসের এখন তার অন্ত নেই। কথার আজ কোন বাধা নেই।

রাবেয়ার হাতকে সজোরে টিপে বিজয় আবার বললে—তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন, রাবেয়া।

রাবেয়া বললে—তোমার প্রয়োজনে তুমি আমাকে কেড়ে নিয়ে চলে যাও, আমার লজ্জার আবরণে আমি ঢাকা পড়ে আছি। যে পারাবারে আমি আছি, সেখান থেকে আমাকে খুঁজে বের করো।

রাবেয়ার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। তার চোখ হতে তারই অজ্ঞাতসারে জল বেরিয়ে এলো।

বিজয় আদর করে বললো—রাবেয়া, তুমি কাঁদছ ?

রাবেয়ার যেন আরও কান্না পেতে লাগলো। রাবেয়া আজ মনের উত্তাপকে চোখের জলে শান্ত করবার চেষ্টা করলো।

বিজয় কম্পিতহৃদয়ে অচঞ্চলভাবে রাবেয়াকে দেখতে লাগলো। বিজয়ের আর কোন কথা বলতে ভাল লাগলো না—কোন কথা বলতে ইচ্ছে হ'লোনা—তাই সে কোন কথা না বলে রাবেয়াকে দেখতে লাগলো। তার পুষ্পিত যৌবনের সৌরভে বিজয় বিমুগ্ধ হ'লো।

নারী রাবেয়া পাগলের মত দৌড়িয়ে গিয়ে ঘরের সুইচটা বন্ধ ক'রে দিলো। পুরুষ বিজয়ের চোখ জলে উঠলো।

নীরেনের কাছে দিনগুলো যখন [illegible] হয়ে উঠলো, নীরেন নিজেকে বইয়ের মধ্যে ডুবিয়ে ফেললো। সে আইনের বই পড়া ছেড়ে দিলো। সে জানতে চায় যে মানুষ ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে পারে কিনা; মানুষের কোন ধর্ম্ম আছে কি-না; মানুষের কর্ম্মের কোন টানা সড়ক্ তৈরী হয়েছে কি-না; মানুষ কি জগতে এসেছে নিজের জন্য, না পরের জন্য; নিজের সঞ্চয় মানুষ কি ভাবে করতে পারে। জগতে যে-সব আন্দোলন হচ্ছে, তা' হল বঞ্চিতের আন্দোলন —এই সব বঞ্চিতদের ও দুর্গতদের উদ্ধার করতে হ'লে আর কাউকে বঞ্চিত না করে কোন বিধান করা যায় কি না। মানুষ কি গড়ে উঠবে নিজের চেষ্টায়, না অপরের অনুগ্রহে। অনুগ্রহ যারা পাবে, তাদের কোন যোগ্যতার প্রশ্ন আছে কি-না। এই সমস্ত নানা জটিল প্রশ্নের সমাধানের জন্য নীরেন সর্ব্বদা বই পড়তে আরম্ভ করলো। নিজের জীবনের প্রতি আজ তার লোভ কমে গেছে বলেই সে মানুষের ধর্ম্মকে জানতে চায়, মনুষ্যত্বের রূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা করছে।

নীরেন পড়ে এবং রাত্রি যখন গভীর হয়, মানুষের কলরব যখন নিশীথের সুষুপ্তিতে থেমে যায়, মানুষ যখন পরস্পরকে ব্যথা দেবার চেষ্টা হ'তে বিরত হয়, সে তখন ডায়েরী লেখে। সে লেখে, জগতের ব্যথার কথা নয়—নিজের ব্যথার কথা; সেই মুহূর্ত্তগুলির

জন্ত সে নিজের কথা ভাবে—নিজের ব্যথা ভাবায় ফুটে তোলে। তখন সে তার একান্ত নিজের জগতে—মানুষের দুর্দ্দ তোলে, নিজের প্রাণের দুর্দ্দ তখন তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়।

নীরেন এই ভাবে দিন কাটাতে লাগলো। তার ধন আছে, তার মোটর আছে, বাইরে তার খ্যাতি আছে, তার যৌবন আছে, তার উজ্জলতর ভবিষ্যৎ আছে, তার সঙ্গ এই স্বার্থপর জগত যাচ্ঞা করে—নীরেন সব ভুলতে চেষ্টা করলো। সব ভুলে গেলো, তার মনে শুধু স্থান পেলো মানুষের কথা, জগতের কথা এবং নিজের ব্যথা।

নীরেনের একদিন ইচ্ছা হোলো যে ডায়েরীর কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে সে অঞ্জলির কাছে পাঠিয়ে দেবে। অঞ্জলিকে সে ব্যথা দিতে চায়না কিন্তু অঞ্জলি তার ব্যথা জানুক, এটাই তার গভীর ইচ্ছা হয়ে উঠলো। তার ক্ষণকালের জন্ত মনে হ'লো তার ডায়েরী মিথ্যা, তার লেখা মিথ্যা, যদি অঞ্জলিই এসব কিছু না দেখলো। আজীবনের সমস্ত সঞ্চয় সে ত্যাগ করতে পারে যদি নীরেন জানে যে অঞ্জলি তার এই ত্যাগের খবর জানতে পেরেছে, এই টুকুন তার দুর্ব্বলতা। সে নিঃস্ব বলে তার ব্যথা নয়, কিন্তু তার ব্যথা হ'ল যদি অঞ্জলি তার এই নিঃস্ব হবার খবরটা না পায়, তার ইতিহাসটা না জানে। অঞ্জলি আজ তার নাগালের বাইরে, এই সত্যের জন্ত তার কোন নালিশ নেই—সে শুধু চায় অঞ্জলির কোন অবসর মুহূর্ত্ত নীরেনের চিন্তায় ভারী হয়ে উঠুক্—কোন মুহূর্ত্তে অঞ্জলির হৃদয় নীরেনের ব্যথায় স্পন্দিত হয়ে উঠুক্। সেই

মুহূর্তের স্পন্দন চিরন্তনের স্পন্দন হবে নীরেনের কাছে, এইটুকু তার কামনা। নীরেন এতো অল্পে তুষ্ট, অথচ এই স্বল্পতার অভাব হ'লে জীবন তার কাছে স্বাদহীন হয়ে উঠে।

কোন এক দুর্বল মুহূর্তে নীরেন ডাকযোগে তার ডায়েরীর কয়েকটি ছিন্নপাতা অঞ্জলির কাছে পাঠিয়ে দিলো। এর ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা সেই মুহূর্তে নীরেনের ছিলোনা। সেই ডায়েরীর পাতায় লেখা ছিলো :—

"অঞ্জলিকে আমার ভাল লাগতো। সে যখন আমার কাছে এসে আমাকে গান শোনাতো, সেই সঙ্গীতময় মুহূর্তগুলি আমার কাছে অমূল্য সম্পদ। সেই ভাললাগা কোন দিন ভালবাসার রূপ নিয়ে আমার কাছে এসে উপস্থিত হ'লো, তা আমি জানিনে। সেই ভালবাসাকে কোন দিন বিচার করিনি কিন্তু আমার মনে-হলো যে আমি অঞ্জলিকে ভালবেসেছি। আমার মনে হলো যে আমি যেন তার জীবন-উদ্যানে স্থান পেয়েছি, তার জীবনের রডোডেনড্রন গুচ্ছের আমি নাগাল পেয়েছি।

"অঞ্জলি আমার কাছে পড়তে আসতো। তাকে পড়াতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে জ্ঞানের ভাণ্ডার কত হাল্‌কা। ওকে পড়াতে গিয়ে আমার মনে ইচ্ছে হতো যে আমি অনর্গল বলে যাব, সেই বলায় থামার বালাই নেই। অঞ্জলি আমার বলা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, কথা শুনে অবাক হবে—ভাববে আমি এতো শিখেছি কবে, এতো জানি কি করে। কিন্তু আমার সব কথা বলা হতোনা, আমি পড়াতে পড়াতে থেমে যেতাম। অঞ্জলি বলতো, গান

শুনবে? আমি লোভী শিক্ষক—ছাত্রীর গান শুনে মুগ্ধ হতাম।

"যেদিন অঞ্জলি স্বেচ্ছায় সুধীরের কাছে চলে গেলো, আমি বাধা দিইনি। অঞ্জলিকে আঘাত দেবার যে আমার ক্ষমতা নেই; যে আমার জীবনকে ভরে দিয়েছে, তার হাসি দিয়ে, তার গান দিয়ে, তার প্রাণ দিয়ে—তার কাছে হীনতা আমার সাজেনা, হীনতা আমার লজ্জার বস্তু। কিন্তু তবুও মনে কোনদিন ভাবিনি যে অঞ্জলি একদিন আমার কাছ হতে এতো দূরে চলে যাবে। জীবন-নদীর মোহনায় এসে দুজনে দুদিকে চলে যাব, একথা স্বপ্নের অগোচর ছিল।

"অঞ্জলির শিষ্টতা এখনো মনে পড়ে, অঞ্জলির হাসি এখনো চোখে ভাসে। জীবনে অঞ্জলিকে পেয়েছি একটি প্রস্ফুটিত গোলাপের মত, কিন্তু অঞ্জলির কথায়, ব্যবহারে, চলা-ফেরায় কোনদিন কোন অসংযম দেখিনি। কতদিন ইচ্ছে হয়েছে যে অঞ্জলি সমাজের আবরণ কেটে ব্যবহারের সঙ্কোচ কেটে আমার কাছে আসুক, কিন্তু তার কোন দুর্বল মুহূর্ত আমার জীবনকে রসপূর্ণ করে তোলেনি। আজ মনে পড়ে, যদি কোনদিন অঞ্জলি তার মনের কথা আমাকে জানাতো, তার মনের গোপনতম ব্যথার ইতিহাস আমাকে বলতো, তাহলে আমার জীবনের আজকের দিনগুলি হয়তো ব্যর্থতার সুরে ভরে উঠতো না। অঞ্জলির কি কোন কথা, কোন ব্যাথা, কিছুই ছিলোনা? তার যৌবন কি আমাদেরই মত মিলনের তরে কেঁপে উঠতো না, সম্ভোগের তরে

ফেটে যেতো না? অঞ্জলি যে সুবীরকে বরণ করে নিলে, এতে কি কোন ব্যথার ইতিহাস লুক্কায়িত নেই? ভগবান, অঞ্জলির জীবন ধন্য করো, তার জীবন সার্থক করো, তার কল্যাণ হোক্, আমি যা অঞ্জলির কাছ থেকে পেয়েছি, তাই যথেষ্ট। আর কোনদিন কিছু চাইবোনা, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত যা' পেয়েছি সেই সম্বলটুকু নিয়েই কাটিয়ে দেবো। অঞ্জলি জীবনে সুখী হোক্—আমার জীবনে সেই হবে পাথেয়।

"রাবেয়া চায় আমার জীবনে স্থান করে নিতে। সে চায় অঞ্জলি যে-স্থান শূন্য করে গেছে, সেই স্থান সে অধিকার করতে। মেয়েরা পুরুষদের কি ভাবে! তারা কি ভাবে যে আমরা হ্যাংলা, যেখানেই লোভের বস্তু আছে, তা দেখে আমাদের জিহ্বা লক্ লক্ করতে থাকে। আমাদের কি নিষ্ঠা নেই, আমরা কি আমাদের ভালবাসাকে শ্রদ্ধা করতে পারিনে? জীবনের বেদীতে যাকে মনে মনে প্রতিষ্ঠিত করছি, সে যে আমাদের কাছে দেবী! তার আসনকে অসম্মান করতে আমি দিতে পারি না।

"অঞ্জলিকে আমি হারাতে পারি—হয়ত হারিয়েছি কিন্তু সেই অভাব পূরণ করা যায় না—পূরণের চেষ্টায় [illegible] বাড়বে বই কমবে না। রাবেয়াকে আমি ব্যথা দিতে চাইনে, কিন্তু আমার প্রাণের ক্ষতস্থানে আমি কাউকে স্থান দেবোনা। সেই ক্ষত স্থান জীবনে আমার স্মরণচিহ্ন—সেই স্মরণচিহ্নকে চিরস্মরণীয় করে রাখবো।

"রাবেয়া একদিন বলেছিল—নীরেনবাবু, আপনার চোখের দৃষ্টি

কি অঞ্জলি সব কেড়ে নিয়েছে? তাই বোধ হয় আমাদের দিকে দৃষ্টি পড়ে না।

"বলতে ইচ্ছে হয়েছিলো—দৃষ্টি পড়ে কিন্তু মনে দাগ্ কাটে না।

"কিন্তু বলিনি।

অঞ্জলি একদিন বলেছিল—নীরেনদা, তুমি বড্ড স্বার্থপর, শুধু আমার সুখ সুবিধেই দেখো।

"সেদিনকার মনের তৃপ্তি স্মরণ করলে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে। ওর সুখ সুবিধে যে আমার স্বার্থ, একথা যে অঞ্জলি বুঝেছে, তা' যে আমার জীবনে কত তৃপ্তির কথা, একথা কি অঞ্জলি জানতো, সে কথা কি অঞ্জলি জানে, সে কথা কি অঞ্জলি জানবে! হয়তো নয়। তবুও সেদিনকার কথা মিথ্যা ছিলোনা, অঞ্জলির সেদিনকার অনুভূতিতে সত্যের ছায়া পড়েছিলো, প্রাণের দরদ্ মাখানো ছিলো।"

ডায়েরীর পাতা ডাকে দিয়ে নীরেনের মনে হ'ল যে, হয়তো সে অন্যায় করেছে।

সেইদিন রাত্রে নীরেন কয়দিনের জন্য নারায়ণগঞ্জে মাসীর কাছে বেড়াতে গেলো। যেদিন অঞ্জলির হাতে ডায়েরীর পাতা গিয়ে পড়বে, সেদিন যেন নীরেনের ঢাকায় থাকা অসম্ভব মনে হ'লো।

সুবীর বিক্রমপুরের গ্রাম পরিদর্শন করে ফিরেছে। সেদিন সকালবেলা অঞ্জলি চায়ের টেবিলে বসে অনেকক্ষণ সুবীরের সঙ্গে হাসি-তামাসা করলে। সুবীর এতোদিন পরে অঞ্জলিকে যেন আরো কাছে পেয়েছে বলে মনে হ'লো। যে ব্যবধান-টুকু সে বোধ করতো, আজ যেন তা' টুটে গেছে। অঞ্জলি একেবারে তারি সামনে, জীবন পথে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। এই নিবিড় সান্নিধ্যটুকু সুবীরের খুব ভাল লাগলো। তাই সে প্রাণ খুলে অঞ্জলির চায়ের টেবিলের গল্পে যোগ দিলো। এই চায়ের টেবিলে বসে সকালের ঘণ্টাগুলো কাটিয়ে দিতে অঞ্জলির সব চেয়ে ভাল লাগে। বেলা বাড়তে থাকে, অঞ্জলির গল্প জমে আসে—নিতান্ত অলস ভাবেই সে সকাল বেলা কাটিয়ে দিতে চায়। মাঝে মাঝে তার মা এসে তাড়া দিয়ে যায় সকাল সকাল স্নান সেরে নিতে। মায়ের কথা সে শোনে—তারপর একটু হেসে আবার গল্প করতে থাকে। কত কথা—এর শেষ নেই।

সেদিন চায়ের টেবিলের আসর জমলো না। সুবীরের এক বন্ধু এসে তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। অঞ্জলি নিরুপায় হয়ে তার নিজের ঘরে গিয়ে টেবিল গোছাতে আরম্ভ করলো। স্নান করতে যাবে কি-না, ভাবছে—এমন সময় তাদের ভৃত্য একখানা ভারী খামের চিঠি দিয়ে গেলো। সে সোৎসাহে চিঠিখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করলো। অনেকখানি পড়ে সে যেন কিছুই বুঝতে

পারলো না। তার বুক দুরু দুরু করতে লাগলো। তারপর আরও কিছুদূর এগিয়ে অঞ্জলি যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলো, তখন তার হাত কাঁপছিলো, গলা শুকিয়ে এলো। সেই দুরুদুরু হিয়া নিয়ে অঞ্জলি চিঠিটা পড়লো—অর্থাৎ নীরেনের ডায়েরীর কয়েকখানা পাতার সঙ্গে তার পরিচয় হলো ; আবার সে পড়লো আগাগোড়া। তার অতীত দিনের পুরাণো কথাগুলি মনের ভিতর ভিড় করে আসতে লাগলো, সে ভিড় অঞ্জলি বন্ধ করতে পারলো না। চিন্তার স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিস্মৃত ঘটনা স্মরণপথে উদিত হলো এবং অঞ্জলির হৃদয়কে আরও উতলা করে তুললো।

অঞ্জলি সাম্‌নের খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়লো। নীরেনের কথা তার বার বার মনে হতে লাগলো, আজ তার হৃদয় বীণার যে কয়টা তার ছিল, সবগুলো তার নীরেনের ব্যথায় ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো। ডায়েরীর পাতাগুলি মাথায় স্পর্শকরে অঞ্জলি মনে মনে বললো—নীরেনদা, আমায় ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, আমাকে বিশ্বাস করো। আজ যে কোন উপায় নেই, নীরেনদা।

কিছুক্ষণ পরে অঞ্জলির মা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি কোন অসুখ করেছে ? এখনও স্নান করতে যাওনি কেন ?

অঞ্জলি বললে—যাচ্ছি মা, কোন অসুখ করেনি।

অবসন্ন হৃদয় নিয়ে অঞ্জলি স্নান করতে গেলো ; সুবীর এলো, একটেবিলে বসে খাওয়া শেষ করলো, গল্প করলো, সবকাজই অঞ্জলি কলের পুতুলের মত করে গেলো।

এই ভাবে দুদিন কাটলো। অঞ্জলি সুবীরকে জিজ্ঞাসা

করলো—কাল ইউনিভার্সিটিতে যাবেনা, আমাদের কনভোকেশন।

সুবীর বললে—তুমি কি তোমার ডিগ্রী আনতে যাবে না কি।

অঞ্জলি—বাঃ, আমি যাবোনা, সবাইতো যাচ্ছে।

সুবীর বললে—তুমি যাও, আমি যাবোনা।

অঞ্জলি বললে—আমি তোমার জন্য স্পেশাল কার্ড নিয়ে আসবো, যেতে কোন অসুবিধে হবে না।

সুবীর বললে—কার্ড পেলেও আমি যাবোনা কারণ আমাদের যেতে নেই।

অঞ্জলি বিদ্রূপের সুরে বললে—কেন, কংগ্রেস কি নিষেধ করে দিয়েছে নাকি।

সুবীরের কাছে অঞ্জলির বিদ্রূপ ভাল লাগলোনা। তাই সে একটু কঠিনসুরে বললে—কেউ নিষেধ করেনি, তবুও আমার যাওয়া হবে না।

অঞ্জলি আর অনুরোধ করলে না। অঞ্জলি হয়ত জিদ্‌করে সুবীরকে নিয়ে যেতে পারতো, কিন্তু মনের সেই অবস্থা তার ছিলোনা।

তারপরদিন অঞ্জলি রাবেয়াকে সঙ্গে করে কনভোকেশনে চলে গেলো। দুই বন্ধুতে একসঙ্গে পাশ করেছে, একসঙ্গে ডিগ্রী আনতে যাচ্ছে, দুজনের মনই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। দুঃখের মাঝেও অঞ্জলির চোখে মুখে হাসি ফুটে বেরুল। একবার খচ্‌করে নীরেনের কথা মনে হলো, আবার ভাবলো যে হয়তো

নীরেন কন্‌ভোকেশনে যেতে পারে এবং তার সঙ্গে দেখাও হতে পারে। নীরেনকে দেখতে তার বড্ড ইচ্ছে হলো। অথচ নীরেনের বাসায় যেতে তার পা কাঁপতে থাকে, যাওয়া হয় না। ভাবলো, হঠাৎ যদি দেখা হয়ে যায় তাহলে বেশ হবে। অঞ্জলি যে অনেকদিন নীরেনকে দেখেনি।

কন্‌ভোকেশন যখন শেষ হলো, তখনও সন্ধ্যা হয়নি। অঞ্জলি, রাবেয়া ও আরও চারজন মেয়ে দাড়িয়ে জটলা করছে, এমন সময় নীরেন সেখানদিয়ে চলে যাচ্ছিলো। হঠাৎ অঞ্জলি ডেকে উঠলো, নীরেন্‌দা। আর সবাই আশ্চর্য্য হ'লো—অঞ্জলির ত এরকম স্বভাব ছিলোনা।

নীরেন থম্‌কে দাড়াতে অঞ্জলি হেসে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো।

নীরেন বললে—এখন বাড়ী যাবে না ?

অঞ্জলি হেসে বললে—হাঁ, বাড়ী যাব, রাবেয়াকে ডেকে নিয়ে আসি।

রাবেয়াকে অঞ্জলি জানালো যে নীরেন তাদের বাড়ী দিয়ে আসবে। রাবেয়া বললে যে সে একটু পরে অন্য মেয়েদের সঙ্গে যাবে। অঞ্জলি নীরেনের সঙ্গে চলে এলো। রাবেয়া তা দেখলো কিন্তু সে যেন কিছুতেই অঞ্জলিকে সঙ্গে নিয়ে নীরেনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে পারলো না। কেমন যেন সঙ্কোচ রাবেয়াকে ঘিরে ধরলো, অথচ রাবেয়ার এই অহেতুক সঙ্কোচ কখনো ছিলোনা।

অঞ্জলি রাবেয়ার অস্বীকারকে সহজভাবে গ্রহণ করে নীরেনের সঙ্গ নিলো। তারা দুজনে ইউনিভার্সিটির সীমানা পার হয়ে বাড়ীর দিকে চললো।

তারা যখন ডাক্‌বাংলোর কাছে এসেছে, তখন সন্ধ্যার আবছায়া এসে চারিদিকের স্তব্ধতাকে রহস্যময় করে তুলেছে। চতুর্দ্দশীর চাঁদ আকাশে দেখা দিয়েছে, পল্টন মাঠের খেলোয়ারের দলেরা বাড়ী ফিরছে, দুএকটা মোটরগাড়ী শাঁ শাঁ শব্দে চলে গেলো।

নীরেন অঞ্জলির ডানহাতের একটা আঙুল ধরে বললে—চলো, একটু বেড়িয়ে যাই। তোমার কি বাসায় তাড়া আছে?

তাড়া তার ছিল, স্বামীকে ফেলে এসেছে, মা তাকে শীঘ্র বাড়ী ফিরতে বলেছে। কিন্তু তবু ও অঞ্জলি নিষেধ করতে পার্লো না। অঞ্জলির অজ্ঞাতসারে কথা মুখফুটে বেরিয়ে এল—বেশ তো, চলো না।

নীরেন অঞ্জলির হাত ছাড়লো না, অঞ্জলি ছাড়াতে চেষ্টা করলো না। পল্টন মাঠকে পাশে রেখে তারা কমলাপুরের রাস্তার দিকে এগুতে লাগলো। রাত্রির নিস্তব্ধতা তাদের দুজনকেই সাহসী করে তুললো।

নীরেন বললে—দেখো অঞ্জলি, আমাকে তোমার ক্ষমা করতে হবে। আমার ডায়েরীর কতকগুলি পাতা তোমার কাছে চলে গেছে, সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে দিয়ো।

অঞ্জলি বললে—আমিতো ক্ষমা করতে পারবোনা, ঐ পাতাগুলি যে আমার জীবনের সঞ্চয়, তা তো আমি ছাড়তে পারবো না।

নীরেনের মুখে আনন্দের যে ছায়া পড়লো, রাত্রির জোয়ার অঞ্জলি তা বুঝতে পারলো না।

নীরেন বললে—আচ্ছা অঞ্জলি, এমন হয় না যে তুমি আমাকে এখনও ভালবাসো। মিলনের সাহায্যে আমি আমাদের ভালবাসাকে পীড়িত করতে চাইনে।

অঞ্জলি বললে—নীরেনদা, আমি তোমাকে ভালবাসি, এখনও ভালবাসি। কিন্তু আমি নারী, আমার যে কতো কাজ, আমার যে কতো প্রয়োজন; আমার জীবনের কাজে, আমার জীবনের প্রয়োজনে আমি তোমাকে ডাকতে পারবো না। তার জন্য দুঃখ করোনা। তোমাকে আমি কৃপণের মত ভালবাসিনি। কিন্তু আজ জীবনের কাজের আহ্বানে আমাকে সরে যেতে হয়েছে, আমার জীবনমালঞ্চকে পুষ্পিত করার জন্য, আমার জীবনের মুহূর্ত্তগুলোকে বিকশিত করার জন্য। তোমাকে যা দিয়ে এসেছি, তা আমি ভুলিনি, তার এক কণাও আমি ফিরে চাইনে নীরেনদা।

এমন সময় একটা মোটর পাশ দিয়ে চলে গেলো; অঞ্জলি নীরেনের গায়ে ঘেসে দাঁড়ালো, তখন আকাশের চাঁদ যেন এক দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে রইলো।

নীরেন বললে—উঃ, এই কথাটি জানবার জন্য আমি পাগল হয়ে উঠেছিলেম। আমার শুধু এই কথাটাই মনে হচ্ছিল যে তুমি আগের দিনের স্মৃতি মুছে ফেলতে চাও কি না। সেই দিনগুলি যে নিতান্ত আমারই ছিল, এ কথা যদি আজ তুমি

স্বীকার করো, আমি এখনও হয়তো আবার মানুষের মত বাঁচতে পারি।

দুজনেই চুপ হয়ে গেলো; পাশাপাশি দুজনে চলতে লাগলো। এই চলাতে যেন ভাষা আছে, তাই নিস্তব্ধতা পীড়াদায়ক মনে হ'লো না।

আবার কতক্ষণ পরে নীরেন বললে—অঞ্জলি, সেই আগের দিন ফিরে পাওয়া আর সম্ভব নয়!

অঞ্জলি সুদূরপ্রসারিত রাস্তার দিকে চেয়ে বললে—সে সম্ভব নয়, নীরেনদা। সে দিন যেন ফিরে না আসে, এই আশীর্বাদই করো।

নীরেন বললে—কেন তুমি ফিরিয়ে আনতে চাও না।

অঞ্জলি সহজস্বরে বললে—তাতে আমার জীবনে গরমিল বেড়ে যাবে। তা' কি তুমি চাও, নীরেনদা?

আবার তারা চলে। নীরেনের বুক কাঁপতে থাকে। অঞ্জলি সঙ্গে সঙ্গে চলে, তাতেই তার পরম তৃপ্তি।

অঞ্জলি হঠাৎ প্রশ্ন করে—নীরেনদা, তুমি বিয়ে কর না কেন? শুনছি, তুমি না-কি প্র্যাক্টিসের আইডিয়া ছেড়ে দিয়ে শুধু রাতদিন ঘরে বসে থাকো। ছি, পুরুষের পক্ষে কি তাই সাজে?

নীরেন অঞ্জলির দিকে তাকালো। অঞ্জলি মুখ ফেরাতে চার চোখের মিলন হলো। দুজনেই চুপ করে রইলো। নীরেনের বলতে ইচ্ছে হ'লো—একথা কি তোমার বলা সাজে? কিন্তু নীরেন বললে—মনের উত্তম আজ যেন চলে গেছে মনে

হয়। আর একজনকে গ্রহণ করার মত মনের ঐশ্বর্য্য আজ নেই।

অঞ্জলি বললে—তার মানে, তুমি বিয়ে না করে চিরকাল আমাকে অপরাধী করে রাখবে!

নীরেন অঞ্জলির কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারলো না। নীরেন শান্ত কণ্ঠে বললে—তোমাকে অপরাধী করে রাখলে যে আমার গৌরব বাড়বে না, তা' আমি জানি। আমি শুধু আমার কথাই বলছিলাম—তোমাকে শাস্তি দেবার জন্যে নয়।

অঞ্জলি কোমল কণ্ঠে বললে—নীরেনদা, তুমি বিয়ে করো। তুমি আমাকে মুক্তি দাও। তুমি আমাকে এতো কঠিন শাস্তি দিয়ো না।

অঞ্জলি নীরেনের সঙ্গে সমান পা' ফেলে চলতে লাগলো। জ্যোৎস্না তখন সমস্ত আকাশ চুয়ে চুয়ে চারদিকের মাঠে ছড়িয়ে পড়েছে। নিঃঝুম নিস্তব্ধতা সেই নির্জ্জন পথকে মধুময় করে তুলেছে। পথের এদিকে ওদিকে বড়ো গাছ আছে, সেখান হ'তে দু'একটা পাখী কিচির মিচির করছে। চোখের সামনে দীর্ঘ প্রসারিত মাঠ, তরল জ্যোৎস্নায় ঝক্ ঝক্ করছে। নীরেন আকাশের দিকে তাকালো, অঞ্জলির দিকে তাকালো, তারপর অঞ্জলির অধরে একটি চুম্বন এঁকে দিলো। অঞ্জলি তৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করলো।

নীরেন হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে—প্রায় নয়টা বাজে।

অঞ্জলি ধীরে ধীরে বললে—এখন বাড়ী ফিরে চলো।

অঞ্জলির বুক কেঁপে উঠলো, তার মায়ের কথা মনে পড়লো। সুবীরের অভিমান হয়েছে, সে কথাও মনে পড়ে গেলো।

সেই জ্যোৎস্না-ভরা মাঠ পার হ'য়ে তারা যখন র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীটে অঞ্জলিদের বাড়ী সামনে এসে উপস্থিত হ'লো, তখন রাত এগারোটা বেজে গেছে। বাড়ীর ফটকের সামনে অঞ্জলিকে দিয়ে নীরেন বিদায় গ্রহণ করলো।

অঞ্জলির মাতা নীচেই অপেক্ষা করছিলেন, তিনি অঞ্জলিকে দেখে বললেন—এতো রাত করতে আছে। ভাগ্যিস, রাবেয়াদের বাড়ী গিয়ে জেনে এসেছিলুম যে তুমি নীরেনের সঙ্গে আছ।

অঞ্জলি এসে মাকে সাদরে জড়িয়ে ধরে বললে—তোমার কি খুব ভয় হয়েছিলো ? আমিতো নীরেনদার সঙ্গে ছিলাম।

তার মা বললেন—সে কথাতো বলে যাওনি যে এতো রাত হবে।

তারা দুজনেই উপরে উঠে গেলো। অঞ্জলি তার ঘরে গিয়ে দেখল যে সুবীর বিছানায় শুয়ে শুয়ে কি একখানা বই পড়ছে। ঘরের এককোণে ভাত ঢাকা রয়েছে। অঞ্জলি তাড়াতাড়ি সুবীরের কাছে গিয়ে হাতের বইখানা ফেলে দিয়ে সুবীরকে জড়িয়ে ধরে একটি গভীর চুম্বন দিলো, মনে হ'লো এতক্ষণের অনুপস্থিতির সব দীনতা এই একটি চুম্বনে মুছে ফেল্‌বে।

সুবীর রাগ করে অঞ্জলিকে সরিয়ে দিয়ে বললে—রাত বারোটা বাইরে কাটিয়ে চুম্বনের অভিনয় করলেই কি অপরাধ চাপা পড়ে?

অঞ্জলির মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। তবুও একবার হাসবার চেষ্টা করে বললে—অপরাধ করেছি বলেই তো এই উপহার তুমি পেলে।

সুবীর জ্রূকুঞ্চিত করে বললে—আমরা কচি খোকা নই, আমরাও সব বুঝি। উপহার যাকে তুমি দিতে চাও, তাকেই দিয়ো। অনশনে থাকলেও উচ্ছিষ্ট অস্বীকার করার মত রুচি আমাদের আছে।

অঞ্জলির চোখ দুটো অপমানে জ্বলে উঠ্‌লো। সে তার মাথার পিন্‌ খুলতে খুলতে কঠিন ভাবে বললে—তুমি কচি খোকা নও জানি, কিন্তু আমিও যে কচি খুকী নই, একথাও তোমার জানতে হ'বে। যে স্বাধীনতা তুমি ভোগ করবে, সেই স্বাধীনতা আমাকেও পেতে হ'বে।

সুবীর উত্তেজিত হয়ে বসে উঠে বললে—রাত বারোটা পর্য্যন্ত নীরেনের সঙ্গে ঢলাঢলি করে স্বাধীনতার কথা বলা শোভা পায় না অঞ্জলি। বল স্বৈরচারিতার কথা।

তারপর ক্রূরভাবে বললে—কি বল অঞ্জলি, আমরাও অনেক কিছু জানি।

এই কুৎসিত ইঙ্গিতে অঞ্জলি পাগলের মত আত্মহারা হয়ে গেলো। ক্রোধে, অপমানে অঞ্জলির দেহ কেঁপে উঠলো।

সে নিষ্ঠুর হয়ে বললো—এতো উচ্ছিষ্টের ভয় যদি থাকে মশাই, সেই উচ্ছিষ্ঠ ফেলে দেবার ঐশ্বর্য্য তার থাকা চাই। ঘরে বসে সন্দেহে পুড়ে মরে লাভ নেই। জীবনে করজোড়ে যারা

অনুকম্পাই গ্রহণ করে গেল, তাদের মুখে অতবড় দাবীর কথা শোভা পায় না। আমার স্বাধীনতা যদি স্বৈরচারিতা বলে তোমার ভ্রম হয়, সেই ভ্রম তোমার ভাঙতে হ'বে, অথবা সেই ভ্রমের ভারে তোমার নুয়ে পড়তে হ'বে। তোমার হীন আশঙ্কার জন্ত আমি আমার গতিকে ব্যাহত করতে পারবোনা।

সুবীর ব্যঙ্গস্বরে বললে—তোমার ঐ দুষ্টি আমি চিনি, তোমার ঐ চোখের জল আমি জানি। তোমাদের অভিনয়ের যথার্থ মূল্য আমি দিতে জানি। তোমার চমক্ দেখে আমার ধারণা ভাঙবেনা। তোমরা ভাবো তোমাদের ঐ দেহটার লোভে আমরা আটক্ পড়ে গেছি, তোমাদের অভিনয়ের সুরে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, তোমাদের ঐ ঢঙে আমরা মারা পড়ে গেছি। আমরা পুরুষমানুষ, তোমাদের সমস্ত কলা-চাতুর্য্যকে ব্যর্থ করে, তোমাদের সমস্ত সত্বাকে অস্বীকার করে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। তোমাদের দেহ দিয়ে দুর্ব্বল পুরুষদের ভোলাতে পারো, কিন্তু আমাকে পারবেনা। যে পুরুষ তোমার দেহের দোলায় দুলবে, তোমার কলায় ভুলবে, সেই বীরপুরুষকে বিয়ে করলেই পারতে।

সুবীরের কাছে নিজের নির্দোষিতার কথা বলতে অঞ্জলি ঘৃণায় শিউরে উঠলো। অঞ্জলি মাথা নত করে একটা চৌকিতে বসে পড়লো।

সুবীর ভাবলো যে অঞ্জলি তার কাছে ধরা পড়ে গেছে বলে চুপ করে আছে। সুবীর এতো বড় আবিষ্কারে উৎসাহান্বিত হয়ে বললে—এখন মনে হয়, সবই আমরা বুঝি। তোমাদের

সমাজের আভিজাত্যের চাকচিক্যের আবরণতলে সমস্ত কালিমার ইতিহাসটুকুই আমরা জানি, তোমাদের শিকারী মেয়ের সমস্ত অস্ত্রের প্রয়োগের খবরও আমরা রাখি। কেমন, এখন বিশ্বাস হয় যে স্বাধীনতার অজুহাতে তোমাদের ছিনিমিনি খেলার খবর আমাদের কানে এসে পৌঁছেচে।

অঞ্জলি নিজেকে সংযত করে নিলো। সুবীরের অসংযত কথার আঘাতে অঞ্জলি একেবারে নুয়ে পড়লো

সুবীর কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার খোঁচা দিয়ে বললে—যদি এতটাই মনে ছিলো, নীরেনবাবুকে বিয়ে করলে না কেন ? না, তোমাদের হয়তো এই স্বভাব যে একজনকে বিয়ে করে আর একজনের সঙ্গে প্রেম করা। দুদিকই বহাল রইলো, কি বলো ! নীরেনবাবুতো আর বিয়ে কচ্ছেন্‌না—আর কেনই বা করবেন।

অঞ্জলির চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল বেরুতে লাগলো। সুবীরের হীন ব্যবহারে অঞ্জলি মর্ম্মাহত হ'য়ে বসে রইলো।

সুবীর বিজয়ী পুরুষের মত বললে—এখন কি করবে অঞ্জলি।

মানুষ যখন অপমানের শেষ সীমানায় আসে তখন সে যে-কোন কঠিন কথা বলতে পারে। মার্জ্জিতরুচিসম্পন্না শিক্ষিতা অঞ্জলির মুখ দিয়ে বেরুল—তোমাকে বিয়ে করেছি বলে অনুতাপ করবো।

অঞ্জলির কথায় শর সুবীরের বুকে গিয়ে খচ্‌ করে লাগলো। এক ঝলক রক্ত যেন সুবীরের চোখে মুখে এসে পড়লো। তার চোখ দুটো লাল হয়ে গেলো, মাথাটা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করতে লাগলো।

সে পাগলের মত নিজের মনে বির্ বির্ করতে লাগলো—তাই হবে, অঞ্জলি, তাই হ'বে।

অঞ্জলি তখন একটি ছোট্ট আর্ত্তনাদ করে চৌকি থেকে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে গেলো। সুবীর অঞ্জলির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

সাতদিন জ্বরের পর অঞ্জলি যখন তার রুগ্ন দেহ নিয়ে তাদের দ্বিতল বারান্দায় এসে একটা ইজি চেয়ারে বসলো, তখন তার জীবনে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। সেই রাত্রির কলহের পরদিন আইন-অমান্য আন্দোলনের মিছিলে যোগ দিয়ে সুবীর কারাজীবন বরণ করে নিয়েছে। তার দুবৎসর কারাবাসের আদেশ হয়েছে, এখন সে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। অঞ্জলির পরদিন ভোরবেলা থেকে জ্বর হ'লো, মাঝখানে ভয়ানক বাড়লো, তিন দিন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রইলো, তার পর ধীরে ধীরে সেরে উঠলো। এখন তার জ্বর নেই বটে, কিন্তু সে নিতান্ত দুর্বল। সুবীর জেলে গিয়েছে, একথাই রাষ্ট্র হয়েছে কিন্তু সেই রাত্রের ঘটনা সুবীর ও অঞ্জলি ছাড়া কেউ জানলোনা। অঞ্জলির জীবনের এতোবড় একটা ঘটনা নিতান্ত অঞ্জলির নিজস্ব হয়েই রইলো। অঞ্জলি রাস্তার দিকে তাকালো, বেশীক্ষণ তাকাতে পারলোনা। কারণ চোখ দুর্বল হয়ে গেছে। তাই সে চোখ বুজ্‌লো।

অঞ্জলির মনের মধ্যে অনেককিছু চিন্তা করবার ঘটনা ভিড় করে এলো, কিন্তু সে চিন্তা করতে পারলো না। সে বুঝতে পারলো যে তার চিন্তা করবার কিছুই নেই, তার জীবনটা ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। তার জীবনবীণার তার সব ছিঁড়ে গেছে, ভাঙ্গা তানপুরার মত আজ সে অযত্নে পৃথিবীর একপ্রান্তে পড়ে আছে। তার কোন মূল্য নেই। যে জীবনকে কিছুদিন আগে

সে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, আজ সেই জীবনের প্রতি তার এককণা দরদ নেই। সেই রাত্রির ব্যবহারে অঞ্জলি নিজে লজ্জিত। যে কথা তার বলা সাজেনি, সে কথা সে রাগের মাথায় বলেছে। "আমি তোমাকে বিবাহ করেছি বলে অনুতাপ করবো," এতো বড় কঠিন মিথ্যা অসঙ্গত বাণী কি করে সে বললে, আজ সে বুঝে উঠতে পারলে না। তার এতোদিনের শিক্ষা সে-রাত্রে কেন মিথ্যা হ'য়ে দেখা দিলো—সে কেন কঠিনভাবে নিষ্ঠুর নীরবতার মাঝে নিজেকে গোপন করে রাখেনি। সুবীরকে সে কেন এতো নিষ্ঠুর অর্থহীন বাণী বলতে গেলো। তার ব্যবহার তাকেই দংশন করতে লাগলো, কিন্তু অঞ্জলি কখনোও সুবীরকে ক্ষমা করতে পারলো না। আজ এতো দুঃখের দিনেও সুবীরের সংযত ব্যবহার, ঔদ্ধত্যপূর্ণ দৃষ্টি, হীন আঘাত, কুৎসিত ইঙ্গিত—কিছুই সে মার্জ্জনা করলো না। তদুপরি সে পারলো না ক্ষমা করতো সুবীরের ভীরুর মত কারা-জীবন বরণ করে নেওয়া—জীবনের দণ্ডকে এড়াতে গিয়ে সে রাজার দণ্ড গ্রহণ করলো। তার সারা জীবন মিথ্যা হোক্, কিন্তু সুবীরকে সে ক্ষমা করতে পারবে না। সে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে নিজের জীবনকে ক্ষইয়ে দেবে, তার জীবনের সমস্ত অভিলাষ চূর্ণ করে দেবে, সমস্ত ঝঞ্ঝা সে হাসি মুখে সইবে—সইতে পারবে। কিন্তু সুবীর তাকে নিবিড়ভাবে জানবার সুযোগ পেয়েও নিজের হাতে স্বেচ্ছায় যে দণ্ড দিয়ে গেলো, সেই দণ্ড যে সুবীর মিথ্যা সন্দেহে, মিথ্যা গর্ব্বে বিধান করেছে, একথা আজকের দিনেও

অঞ্জলি ঘোষণা করতে প্রস্তুত। দণ্ডকে সে স্বীকার করে নিলো, প্রতিহিংসা করার মত কুরুচি তার নেই, কিন্তু তবুও সে সুবীরকে ক্ষমা করতে পারলোনা। সেই রাত্রে সুবীরের ব্যবহার যে ক্ষমার বাইরে, তা ভেবেও অঞ্জলি অনুশোচনার দংশনে ব্যথা পেতে লাগলো।

আশ্বিনের পরিষ্কার আকাশে হঠাৎ এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়ে গেলো। লাবণ্যদেবী এসে জিজ্ঞাসা করলেন—অঞ্জলি, তোমার বিকেল বেলার ঔষধ খেয়েছ?

অঞ্জলি চোখ বুজেই বললে—হাঁ, খেয়েছি।

লাবণ্যদেবী অঞ্জলির শুকনো মুখখানাকে ভালো করে দেখে নিয়ে একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে গেলেন। হঠাৎ রাবেয়ার সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হ'লো। রাবেয়া বললে—আজতো অঞ্জলি ভাল আছে?

লাবণ্যদেবী রাবেয়াকে অঞ্জলির কাছে যেতে ইঙ্গিত করে নীচে নেবে গেলেন।

রাবেয়া এসে স্নেহার্দ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—আজ কেমন আছো, অঞ্জলি।

অঞ্জলি বললে—রাবেয়া!

রাবেয়া পাশের একটা চৌকিতে বসে অঞ্জলির একখানা শীর্ণ হাত ধরে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে—তোকে কিন্তু ঠিক্ তপস্বিনীর মত দেখাচ্ছে—চুল উস্‌কো খুস্‌কো, মুখ মলিন অথচ তাতে দিপ্তী আছে। সারা দেহে একটা শুষ্কতা, অথচ

একটা কঠিনতা আছে। মনে হয় কোন তপক্লিষ্টা সুন্দরী দেবী এই ধরণীতে এসেছে।

অঞ্জলি অলসভাবে বললে—আমার তো আজ কোন প্রার্থনা নেই রাবেয়া, আমি তপস্যা করবো কার জন্যে। আমার তো এই ধরণীর প্রতি কোন দাবী নেই, কোন অধিকার নেই, সমস্ত অধিকার নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে ভাই, সব দাবী চুকে গেছে।

অঞ্জলির কাতরকণ্ঠ রাবেয়াকে ব্যথা দিলো। রাবেয়া বললে —কেন অঞ্জলি, তুমি এতো কষ্ট করছো। সুবীরবাবু হয়তো দুবৎসরের আগেই আসতে পারেন। শুনছিতো যে এমনেষ্টি হবে, তাহলে তো যে-কোন দিন চলে আসতে পারেন।

অঞ্জলি তার শীর্ণ হাতখানা রাবেয়ার কোলে রেখে চোখবুজে বললে—আমাকে তিনি যে দণ্ড দিয়েছেন, তাতে কোন এমনেষ্টি নেই। তিনি মুক্তি হয়তো পেতে পারেন, কিন্তু ফিরে আসবার পথ তো বন্ধ হয়ে গেছে, রাবেয়া। আমার এই ভারী দিনগুলো কি করে কাটাবো রাবেয়া; আজ আমার মত নিঃস্ব কেউ নেই একটা ভিক্ষাপাত্র সংগ্রহ করতে ও আজ আমি অক্ষম!

রাবেয়া অঞ্জলির কথার তাৎপর্য্য বুঝলোনা, তাই সে ! করে রইলো।

রাবেয়া কিছুক্ষণ পরে বললে—সুবীর বাবু কি খালাস পেলে কংগ্রেসের কাজ ছাড়বেন না? তিনি কি আবার জেলে যাবেন?

অঞ্জলি ধীরে ধীরে বললে—তার তো কংগ্রেসের কাজ আ

সেই অহঙ্কার আছে। আমাদের গৃহ ভাঙলে, কি নিয়ে আমরা থাকি বলতো। অথচ, আমাদের থাকতে হবে, তাদের ধর্ম মানতে হবে নিজের জীবনকে দলিত করে। আচ্ছা রাবেয়া, আমাদের কি কোন অহঙ্কার করতে নেই, কোন অধিকার দাবী করতে নেই? যে মেয়ের বিয়ে হল, তার কি মা হওয়া ছাড়া আর কোন অধিকার নেই?

রাবেয়া উৎসাহান্বিতা হয়ে বললে—কেন, মেয়েরা তো পথের পরগাছা নয় যে জীবনপথে তাদের কোন স্থান নেই। তাদের অধিকারকে মাড়াতে গিয়ে পুরুষ পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজেরাই এগুতে পারবে না।

অঞ্জলি মাথা নেড়ে বললে—মিথ্যা কথা রাবেয়া, মিথ্যা কথা। বিয়ে হলে মেয়েদের সব অধিকার ছেড়ে দিতে হয়। যে না ছাড়বে, তার জীবনে সে পাবে সংঘাত; আর যে ছাড়বে, তার মধুর মিলনের প্রশংসায় তোমরা হবে মুখর। পুরুষ তোমাকে নিঃশেষ করে পেতে চায়, তোমার নিজস্ব কিছু রাখলে সে হবে অসন্তুষ্ট। এমনিই ছাই মেয়েদের জীবন যে পুরুষের অসন্তোষকে তুচ্ছ করার অধিকার আমাদের স্বল্পপরিসরপূর্ণ সমাজ অনুমোদন করবে না।

রাবেয়া জিজ্ঞাসু চোখে বললে—পুরুষ তার অহঙ্কারের ঔদ্ধত্যে আমাদের জীবনের সব জানলাগুলো বন্ধ করে দিতে চায় কেন? বদ্ধ ঘরে থেকে আমাদের জীবন যদি পঙ্গু হয়ে যায়, তাতে কি ওদের কোন ব্যথাই লাগবে না?

অঞ্জলি চোখ চেয়ে বললে—ওরা আমাদের ব্যর্থতার দিকে তাকায় না ভাই, ওরা নিজেদের সার্থকতা নিয়ে মত্ত থাকে। নারী নিজেকে ব্যর্থ করে পুরুষকে সার্থক করার চেষ্টা করেছে, একথাতো নারীর জীবনে নতুন কথা নয়। কিন্তু কোন পুরুষ নিজেকে ব্যর্থ করে কোন নারীকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করবে, সে কথা তুমি বিশ্বাস করো? পুরুষ পেতে জানে ভালবাসা, দিতে জানে দম্ভ। মেয়েরা সেই দম্ভকে ভাবে পুরস্কার।

রাবেয়া বললে—আমরা যদি সেই দম্ভ গ্রহণ করতে অস্বীকার করি।

অঞ্জলি বললে—পুরুষের সমাজ ছি ছি রব করে উঠবে, মেয়েরা তাতে সায় দেবে।

রাবেয়া বললে—পুরুষের প্রয়োজন মেয়েদের কাছ থেকে নিষ্ঠা, তাদের স্বাতন্ত্র্যের উপর ওরা দাবী করতে যায় কেন?

অঞ্জলি বললে—পুরুষের স্থূলবুদ্ধিতে ওরা স্বাতন্ত্র্যকে ভাবে স্বৈরচারিতার আর একটা রূপ, সম্মানহীন দাস্যভাবকে ওরা ভাবে নিষ্ঠা। রাবেয়া, কিছু দাবী না করে যদি দিয়ে যেতে পারিস্, পুরুষকে দেখবি তোর হাতের মুঠোয়, কিন্তু ভুল করে তখন যদি নিজের দাবী পেশ করিস্, দেখবি সেই নিরীহ পুরুষ কি রকম হিংস্র হয়ে উঠে। ওদেরকে বিশ্বাস করিস্‌নে, ওরা জন্তু।

একথা বলতে গিয়ে অঞ্জলির চোখের জল বাধা মানলো না। টপ্ টপ্ করে চোখের জল পড়তে লাগলো।

এমন সময় লাবণ্য দেবী নীরেনকে সঙ্গে করে উপরে উঠে

এলেন। রাবেয়া হেসে নীরেনকে বসতে একটা চৌকি দেখিয়ে দিলো, লাবণ্য দেবী চলে গেলেন। নীরেনকে দেখে অঞ্জলির চোখের জল আরও হু হু করে আসতে লাগলো। নীরেন কোন কথাই বলতে পারলো না। শুধু অঞ্জলির চোখের জল দেখে তার নিজের চোখ ছুটোও অশ্রুপূর্ণ হয়ে এলো।

সন্ধ্যার আবছায়ায় অঞ্জলি, রাবেয়া ও নীরেন চুপচাপ করে বসে রইলো। সবারই অনেক কথা বলবার ছিলো, কিন্তু কারোরই কোন কথা বলা হলো না।

সন্ধ্যা ক্রমে ক্রমে রাত্রির কোলে এলিয়ে পড়লো, নীরেন বাণীহীন ভাবায় অঞ্জলিকে তার সমবেদনা জানালো।

রাবেয়া একদিন দুপুরবেলা অঞ্জলির কাছে এসে উপস্থিত। রোগক্লিষ্টা অঞ্জলি তার শীর্ণ হাতখানা দিয়ে তাকে কাছে আদর করে বসালো। রাবেয়া আদরের স্পর্শ পেয়ে কেঁদে ফেললে।

রাবেয়া বললে—অঞ্জলি, তোর কাছে কোন কথাই আমার অজানান নেই। তোর কাছে আজ আমি ভিক্ষা চাইতে এসেছি।

অঞ্জলির মলিন চোখে হাসির আভাস দেখা দিলো। বললে—ভালো লোকের কাছেই এসেছো। যার নিজের জীবন পথপ্রান্তে অনাদৃত হয়েই রইলো, সে কি না অনুগ্রহ বিতরণ করবে অন্যকে!

রাবেয়া বললে—জানি অঞ্জলি, সবই জানি, তোর কাছে ভিক্ষা চাইবার এসময় নয়, কিন্তু আমার যে আর সময় নেই।

অঞ্জলি জিজ্ঞাসুনেত্রে দুর্বলভাবে তাকিয়ে রইলো।

রাবেয়া বললে—নীরেন বাবুকে তোর মুক্তি দিতে হবে। তাকে আমার যে বড়ো প্রয়োজন!

অঞ্জলি রাবেয়ার দেহ স্পর্শ করে বললে—আমিতো তাকে কোন বন্ধনেই আটকে রাখিনি ভাই।

রাবেয়ার চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠলো। সে বলে উঠ্লো—তিনি যে আমায় বল্লেন যে তোমার অনুমতি না পেলে তিনি মুক্ত নন্। মুক্তি তোকে দিতেই হবে।

অঞ্জলি চোখ বুজে রইলো. তার বুকের ভিতরটা টন্ টন্ করে উঠ্লো. মুখখানা আরও বিষণ্ণ হয়ে গেলো।

অঞ্জলি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে—একদিন আমিই তোকে বলেছিলেম নীরেনদাকে বিয়ে করতে, তখন আমার দৃষ্টি ছিলো সম্মুখে প্রসারিত। আজ আমার সম্মুখে পথ নেই, তাই পিছনের মায়া ও মোহ আমাকে ঘিরে ধরেছে। আজ মাপ করো রাবেয়া, কাউকে কোন বন্ধনে আট্কাতে চাইনে বটে কিন্তু কাউকে মুক্তি দেবার ঐশ্বর্য্য আমার কোথায় ?

রাবেয়া যেন হাল ছেড়ে বললে—বেশ, তাই হোক্ অঞ্জলি। আমার অপমানিত প্রেমের গ্লানি আমিই সহ্য করবো।

অঞ্জলি চোখ চেয়ে বললে—কেন রাবেয়া, তুমি তাকে বুঝিয়ে বললেই তিনি রাজী হবেন।

রাবেয়া একটি ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে—তা হবার নয় ভাই, তা হবার নয়। তা সম্ভব হলে আমি মেয়েমানুষ হয়ে বান্ধবীর কাছ থেকে স্বামী ভিক্ষা করতে আসতুম না। আমি এসেছিলেম আমার প্রয়োজনের তাড়ায়, আমারই ভারী দিনগুলোকে হাল্কা করার জন্যে। বিজয়ের হাত থেকে বাঁচবার জন্ম নীরেন বাবুকে আমার প্রয়োজন, ভাই। আমাকে বাঁচতে দে অঞ্জলি।

অঞ্জলি যেন রাবেয়ার ইঙ্গিত বুঝতে পারলো।

অঞ্জলি আজ সব হারিয়েও যেন প্রসন্ন মনে রাবেয়ার কথায় সায় দিতে পারছিলোনা। অঞ্জলি আজ রিক্ত, তাই

রূপলতা আজ ওকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেললে। নীরেন রাবেয়াকে বিয়ে করলে অঞ্জলি খুসীই হ'বে। অনুমতির প্রশ্ন অঞ্জলির মনে কোনদিন জাগেনি কিন্তু নীরেন যখন অতীতের দিনগুলিকে সঞ্চয় করে রাখতে চায়, তখন যেন অঞ্জলি তাকে বাধা দিতে সঙ্কোচ বোধ করল। অথচ রাবেয়ার যেখানে অপমান, সেখানে হ'ল নারীর অপমান। নারীকে সে ছোট হ'তে দিতে পারেনা, দিতে পারবেনা।

বুকের পাঁজর মথিত করে যে-বাণী উত্থিত হ'য়েছিলো, তা' অনুচ্চারিত রয়ে গেলো। যে-কথা অঞ্জলি বললে, তা' হ'ল মুখের কথা।

অঞ্জলি বললে—যে নিজে ব্যর্থতার স্বাদ পেয়েছে, সে বোধ হয় পরম শত্রুকেও ব্যর্থতার দিকে ঠেলে ফেলবেনা। তোর প্রেম যাতে ব্যর্থ না হয়, সেই চেষ্টা আমি করবো। তোর প্রেম সার্থক হোক্ রাবেয়া, কিন্তু কোনদিন কিছু লোভ করিস্‌নে। নারীর ওপর বিধাতার অভিশাপ আছে যে তার অহঙ্কার করতে নেই। পুরুষকে গ্রহণ করবি প্রেমে, সুখী করবি সেবায়, নিজেকে ডুবিয়ে দিবি পুরুষের ঔদ্ধত্যে।

অঞ্জলির চোখে জল দেখা দিলো—মলিন গণ্ড বেয়ে বড় বড় দু'ফোঁটা অশ্রুজল গড়িয়ে পড়লো। রাবেয়া স্তব্ধময়ী পাষাণ-মূর্ত্তির মত অঞ্জলির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

র‍্যাঙ্কিনষ্ট্রীটে মধ্যাহ্নের নির্জ্জনতা দৃশ্যকে আরও সকরুণ করে তুললো।

ঢাকায় ছোট্ট সমাজে রাবেয়া-নীরেনের বিবাহ সংবাদ সহজেই প্রচারিত হ'য়ে গেলো। ক্রমে ক্রমে বিজয়ের কানে ও সেই সংবাদ পৌছলো। বিজয় প্রথম একটু হাসলো—মনে মনে ভাবলো যে এই মিথ্যা সংবাদ নিয়ে যদি প্রতিবেশীরা নিশ্চিন্ত থাকতে চায়, সে বাধা দেবেনা। রাবেয়ার মত শিক্ষিতা রুচিসম্পন্না মহিলা যাকে স্বেচ্ছায় ও সাদুনয়ে দেহ উপভোগ করতে দিয়েছে, তাকে অতিক্রম করে সে অন্যের গলায় মালা পরাতে যাবে পরিবারের আভিজাত্যের অজুহাতে, একথা বিজয় চিন্তা করতে পারলোনা—চিন্তা এলেও স্বীকার করতে পারলোনা। একথা সত্যি যে বিজয় যা' পেয়েছে, তা' সমাজ চোখের অন্তরালে। কিন্তু যে-প্রেম গোপনে বিকশিত হয়ে সঙ্গোপনে উৎসর্গীকৃত হয়েছে, তার আসন আনুষ্ঠানিক প্রেমের অনেক উপরে। বিজয়ের মনে এতদিন যে ভীরুতা সঞ্চিত ছিলো, রাবেয়ার দেহ-দানে তা' অপসারিত হ'য়ে গেছে। বিজয় এখন নিশ্চিন্ত। কিন্তু এমনি এক নিশ্চিন্ততার দিনে বিজয়ের বোন মনীষা তার দাদাকে ঠাট্টা করে বললে—তোমার রাবেয়া তো নাগালের বাইরে চলে গেলো। আমাদের মঞ্জুলাকে বিয়ে করোনা?

বিজয় হাসতে হাসতে বললে—রাবেয়া তো নাগালের ভিতর কোন কালেই ছিলোনা, আমি তো তাকে জয় করে নিজের কাছে এনেছি।

মনীষা মুচকি হেসে বললে—তোমার পরাজয়ের খবর এখনও পাওনি তা হ'লে।

বিজয় বললে—খবর যা' পেয়েছি, তাকে সত্য বলে গ্রহণ করে রাবেয়াকে আমি অপমান করতে চাইনে। তোদের সমস্ত খবরকে অসত্য করবার শক্তি আমার কাছে আছে।

মনীষা আশ্চর্য্যান্বিতা হ'য়ে বললে—সত্যিই দাদা, আমি রাবেয়ার কাছ থেকে শুনে এসেছি যে তাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে—আস্‌ছে বৈশাখে বিয়ে হ'বে।

বিজয় বললে—মাত্র পনর দিন বাকী। কই, রাবেয়া তো আমাকে বলেনি।

মনীষা বললে—এইতো সেদিন মাত্র স্থির হ'লো। নীরেনবাবু প্রথমটা সম্মত ছিলেননা—শুনেছি, অনেক অনুরোধের পর তিনি সম্মতি দিয়েছেন। তোমাকে যদি ভালই বাসবে, তাহ'লে নীরেনবাবুর সম্মতির জন্য এতো চেষ্টা কেন?

মনীষা এক নিঃশ্বাসে কথা শেষ করে ঘর থেকে চলে গেলো। বিজয় বিমূঢ়ের মত ইজিচেয়ারে বসে রইলো। যে স্বেচ্ছায় সম্মতি দিয়েছে, তাকে অস্বীকার করে মেয়েরা আর একজনের সম্মতি প্রার্থনা কেন করতে যায়, এই প্রশ্নই বিজয়ের মনের কন্দরে বার বার করে ঘুরতে লাগ্‌লো। বিজয়ের তবুও একটু সন্দেহ হ'লো। মেয়েমানুষ সর্ব্বস্ব দিয়ে কি এতো সহজেই আবার সর্ব্বস্ব ফিরিয়ে নিতে পারে? অথবা তাদের দেয়া-নেয়া শুধু সময় কাটাবার ফিকির? রাবেয়া ছিলো তার

স্বপ্নের মানুষ। স্বেচ্ছায় রাবেয়া বিজয়কে ছুঁতে দিয়েছে, ধরতে দিয়েছে, নিজের আবেগে তারি স্পর্শে রাবেয়া ফেটে চৌচির হয়েছে। এর পর আবেগহীন, উত্তাপহীন দেহ ও মন নিয়ে নীরেনের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কোন্ লজ্জায় সে দাঁড়াবে! রাণীর ঐশ্বর্য্য নিয়ে তারই ফুলবনে চরণস্পর্শে যে নব নব মায়া রচনা করতে পারতো, যার নিপুণ চরণছন্দে সমস্ত বনপথ ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠতো, সে তার নিজের জীবনের তাল কেটে অপরের বনপ্রান্তে স্থান করে নেবার দারিদ্র্য গ্রহণ কোন্ মায়ামন্ত্রে করতে চায়? নীরেন জ্ঞানী, গুণী, ধনী—যদি নীরেনই তার কাম্য হ'তো, তাহ'লে রাবেয়া তার দেহের উত্তাপে বিজয়ের মনকে কেন বিগলিত করেছে? এই ধাঁধাঁ বিজয়কে পেয়ে বসলো—বিজয় মেয়েদের মন-হীন দেহ ও দেহ-হীন মনের খেলার মূলসূত্র খোঁজার চেষ্টা করলো, থই পেলোনা।

ধাঁধাঁর উত্তর পাবার আশায় বিজয় রাবেয়াদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'লো। তখনো সন্ধ্যা হয়নি। রাবেয়া বাড়ী ছিলোনা বলে বিজয় পড়বার ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলো। রাবেয়ার মা কিছুক্ষণের জন্য এসে বিজয়কে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলেন। বিজয়ের মনে হ'লো যে রাবেয়ার মা যেন তার উপস্থিতিকে ভাল চোখে দেখলেন না। মনে হ'লো সমস্ত বাড়ীটা যেন তাকে অনাদর করছে—সম্ভাবণে যেন পূর্ব্বকার নিবিড়তা নেই, আলাপে যেন পুরাণো স্নেহ নেই। সবই যেন রসহীন

ফর্ম্মাল ব্যবহার। রাবেয়া যখন ঘরে এলো, বিজয় তখন রাবেয়ার একখানা ইংরেজী বই পড়ছিলো। রাবেয়ার আসা বিজয় টের পায়নি। রাবেয়া যখন পাশের চৌকিটা টেনে বসলো, তখন বিজয় চমকে উঠলো।

রাবেয়া একটু হাসলো।

বিজয় বললে—অনেকক্ষণ বসে আছি।

রাবেয়া দুঃখের সুরে বললে—বাইরে একটু কাজ ছিলো, তাই দেরী হ'য়ে গেলো। আপনাকে চা দিয়েছে?

বিজয় বললে—আমিতো চা খেতে আসিনি।

রাবেয়া হাসলো—চাকরকে দু পেয়ালা চা আনতে বললো।

বিজয়ের মনটা দমে গেলো। সে কি বলবে কিছুই খুঁজে পেলোনা।

রাবেয়া ভণিতা না করে বললে—আপনাকে একটা সংবাদ দেওয়া হয়নি। আমি কালই আপনার বাড়ী যেতাম, ভাবলাম হয়তো আজ আপনি আসতে পারেন। আপনি শুনে খুসী হবেন যে আমার বিয়ের দিনস্থির [illegible] গেছে, পাত্রও স্থির হয়েছে।

রাবেয়া বাঁকা চোখে বিজয়ের দিকে তাকালো।

বিজয় শুধু বললে—কথাটা তাহ'লে সত্যি?

রাবেয়া বললে—কোন কথাটা?

বিজয় বললে—এই আপনার বিয়ের কথাটা।

রাবেয়া একচুমুক চা খেয়ে বললে—ওঃ, আপনি শুনেছেন!

বিজয় বললে—শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি।

রাবেয়া বিস্মিতা হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—এই খবরে অবিশ্বাস করার কি আছে! অবশ্যি বলতে পারেন যে আমাদের আবার কে বিয়ে করবে!

রাবেয়ার কথা বলার সহজভঙ্গীর জন্ম বিজয় মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলো। অথচ রাবেয়াকে যেন আজ আরও তার ভাল লাগলো।

বিজয় টপ্ করে রাবেয়ার হাত ধরে বললে—রাবেয়া, আমি যা' জেনে এসেছি, তুমি যা' জানতে দিয়েছ, তাহ'লে সে সব মিথ্যা?

রাবেয়া ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—মাপ করবেন বিজয়বাবু, বান্ধবীর সম্মান রাখতে না জানলে অসম্মান আপনাকে পেতে হ'বে। আমি এখন স্ত্রী হ'তে যাচ্ছি, আপনার অশোভন চপলতা সংযত করতে হ'বে।

বিজয়ের হাত অবশ হয়ে খুলে গেলো।

সেও বিরক্তির সুরে বললে—সংযম! তুমিইতো স্বেচ্ছায় তোমার শুচিতা নষ্ট করেছো। আমাকে নিয়ে এই পুতুল খেলবার কি প্রয়োজন ছিলো, রাবেয়া?

রাবেয়া সহজসুরে বললে—আমি যা' ছিলেম, আজ আমি তা' নই। যে-ব্যবহার আগে আমার বাধতো না, আজ সে-ব্যবহার সাজে না। আমি আমার স্বামীকে ফাঁকি দিতে পারিনে—তাই যা পেয়েছেন, তা' নিয়ে আপনার বিদায়

গ্রহণ করতে হ'বে। ভবিষ্যতে আমাদের যেন আর দেখা না হয়।

বিজয় শুধু বললে—দেখা দিতেও বাধা!

রাবেয়া দৃঢ়স্বরে বললে—অতীতকে আমি ভুলে যেতে চাই ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করবার জন্ত।

বিজয় বললে—তাহ'লে বুঝবো যে আপনি আমাকে প্রতারণা করেছেন নিজের গরজে। যা দিয়েছি বলে গর্ব্ব করি, তা' মিথ্যা।

রাবেয়া বললে—আপনার সঙ্গে এই আলোচনা আমার শোভা পায় না।

বিজয় "হুঁ" বলে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার জানিয়ে চলে গেলো—ভেবেছিল যে রাবেয়া হয়তো বসতে বলবে, কিন্তু রাবেয়া সেই চৌকিতেই বসে রইলো।

মনের এই উত্তেজিত অবস্থায় বিজয় বাড়ীর দিকে না গিয়ে রমনার মাঠের দিকে গেলো।

কিন্তু মাঠে যেতে যেতে শুধু এই কথাটাই বিজয় বারবার ভাবতে লাগলো যে মেয়েরা ছোটখাটো সুখ সুবিধার জন্তে নিজেকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে। এ যেন নিজেকে দিয়ে নিজেকে কিনে আনা—যতটা নিজেকে দিলে, তার দ্বিগুণ পরিমাণে নিজের জন্ত পেলো। রাবেয়ার দেহের পারাবার যেদিন বিজয় পার হ'লো, সে ভেবেছিলো যে রাবেয়ার মনভূমির সে খোঁজ পেয়েছে কিন্তু দেহের ভেলায় বিজয় যে শুধু অকূলের দিকে

চলে এসেছে, তা' সে কল্পনাও করতে পারেনি। নীরেনের স্ত্রী হবার যে সামাজিক গৌরব, সাংসারিক সুবিধা, তার লোভ রাবেয়া ত্যাগ করতে পারলো না, অথচ যাকে ঘিরে রাবেয়ার যৌবন-কুসুম বিকশিত হয়েছে, সে হলো আজ সব চেয়ে তুচ্ছ, সব চেয়ে অপ্রয়োজনীয়। অথবা মেয়েরা দেহ দেয় খেয়ালে, প্রণয় করে কৌতূহলে, বিয়ে করে স্বার্থের টানে। রাবেয়ার কাছে বিজয়ের যতদিন প্রয়োজন ছিলো, অনেক খেলাই রাবেয়া খেলেছে। প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই আজ সে ধিকৃত।

আজ পুরুষ-বিজয় নারী-রাবেয়ার কাছে অবহেলিত হ'য়ে মেয়েদের নীচতা সম্বন্ধে কত কথা ভাবতে লাগলো। তার মনে হলো পুরুষরা যুগে যুগে নারীদের কাছে প্রতারিত হয়ে এসেছে আর তারাই যুগে যুগে নিজেদের গৌরবে নারীর মহিমা প্রচার করে এসেছে। নারী করেচে প্রতারণা, পুরুষ দিয়েচে সম্মান; নারী পোষণ করেছে নিজের ব্যথা, পুরুষ ভুলেছে নিজেকে; নারী ঢেলেছে বিষ, পুরুষ বণ্টন করেছে অমৃত; নারী রয়েছে প্রয়োজনের গণ্ডীতে আবদ্ধ, পুরুষ বিচরণ করেছে কল্পনার মেঘলোকে। আজ পুরুষ তার মহত্বের বেড়া ভেঙে নির্ম্মম হ'তে শিখুক—বিজয়ের মনে এই বাসনাই জাগ্রত হ'য়ে উঠলো। পুরুষের ব্যথায় বিজয় আজ বিমর্ষ, নারীর ছলনায় সে আজ স্তব্ধ।

রমনার মাঠে অনির্দ্দিষ্ট আঁকা-বাঁকা পথে বেড়াতে বেড়াতে

যখন রাত দশটা বেজে গেলো, তখন [illegible] মনে পড়লো বাড়ীর কথা, তার বোন মনীষার ঠাট্টা। [illegible]গতিতে সে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লো।

রাবেয়া ও নীরেনের বিয়ে হ'য়ে গেলো। বিজয় নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিলো বটে কিন্তু রাবেয়ার কোন অনুরোধ পায়নি। তাই সেদিন রাত্রে বিজয় তার মামার বাড়ী নারায়ণগঞ্জে কাটিয়ে এলো। অঞ্জলি দেহ ও মনে অবসন্ন—সে যেতে পারেনি বলে বর ও ক'নে বিয়ের পরের দিন অঞ্জলিদের বাড়ী এসে শুভেচ্ছা নিয়ে গেলো। নীরেনের বিশ্বাস যে সে অঞ্জলিকে ব্যথা দিয়ে সুখ পাবেনা—এবং পেতেও চায়না। অঞ্জলি অন্তরের সঙ্গে শুভেচ্ছা জানিয়েছে, প্রাণভরে সেদিন কেঁদেছে। স্বেচ্ছায় একদিন অঞ্জলি নীরেনের যৌবন-মন্দিরে প্রেমের বাতি-গুলি জ্বালিয়ে দিয়েছিলো, আবার স্বেচ্ছায় সে বাতিগুলি নিবিয়ে দিলো। নীরেন সেই আলোতে নিজেকে দেখে নিয়ে-ছিলো, অঞ্জলির পরিচয় পেয়েছিলো। দীপ নির্ব্বাপিত হয়ে গেছে বটে, কিন্তু নীরেন সেই দৃষ্টি হারায়নি। অঞ্জলি নীরেনকে যে-দৃষ্টি দিয়েছে, সেই দৃষ্টিতে নীরেন অঞ্জলির ব্যথা বুঝেছে। সেই ব্যথাতুরা অঞ্জলি যখন নীরেনকে অনুরোধ জানালো রাবেয়াকে বিয়ে করতে, নীরেনের কাছে অসঙ্গত মনে হ'লেও অসম্ভব মনে হয়নি। অঞ্জলির ব্যথার দিনে অঞ্জলির অনুরোধকে নীরেন অস্বীকার করতে পারলোনা। অঞ্জলির মনের ব্যথাকে নীরেন জানতো, তবুও অঞ্জলির মুখের কথাকে সে অগ্রাহ্য করতে পারলোনা। অঞ্জলির প্রেমে মহীয়ান হ'য়ে নীরেন

রাবেয়াকে গ্রহণ করেছিলো—রাবেয়া তা' জানতো। রাবেয়ার প্রয়োজন ছিল নীরেনকে, তাই অঞ্জলির কাছে নীরেনকে ভিক্ষা করে পেতে সঙ্কোচ বোধ করেনি। নীরেনের জীবনে প্রতিফলিত আলোকের সূক্ষ্ম বর্ণ বিচার করবার অবসর রাবেয়ার ছিলোনা।

এইভাবে রাবেয়া ও নীরেনের পরিণয় সম্পন্ন হ'লো। কিন্তু পরিণীতা অঞ্জলি নিজের পরিণয়ের ব্যথায় জর্জ্জরিত হ'য়ে রইলো। বিজয় তার নিজের জীবনের পরিণতি দেখে বিস্মিত হ'লো। সংসারের পরিণাম জেনেও মানুষ জীবন-সম্ভারের পরিবেশনের ত্রুটি হ'লে পরিতাপ করতে থাকে। রাবেয়া তাঁর নব জীবনকে পরম পরিতোষের সঙ্গে গ্রহণ করলো এবং প্রেমের আলোতে প্রজ্জলিত করে রাখবে বলে পণ করল।

একদা রাবেয়া অঞ্জলিকে দেখতে এলো। সিঁড়িতে অঞ্জলির মার সঙ্গে রাবেয়া ও নীরেনের দেখা হ'লো।

অঞ্জলির মা লাবণ্য দেবী বললেন—তোমরা এসেছো, ভালই হয়েছে। অঞ্জলি দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে, অথচ কিছুই খেতে চায়না। এইতো দুধ নিয়ে গেছলাম, কিছুতেই খেলে না।

নীরেন বললে—জ্বরতো হয়নি।

লাবণ্যদেবী বললেন—না, এখন তো এমনি ভালই আছে; ঔষধ বা পথ্য কিছুই খেতে চায়না তাই দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে।

রাবেয়া বললে—শরীরকে এমনভাবে মাটি করে লাভ কি?

লাবণ্যদেবীর চোখের কোণে জল দেখা দিলো। তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে রাবেয়া নীরেনকে বললে - অঞ্জলি নিজেকে immolate করে অন্যায় করছে।

নীরেন বিমর্ষভাবে বললে—Luxuriate করবার প্রয়োজন মিটে গেছে বলে।

রাবেয়া বললে—প্রয়োজন মিটবে কেন? সুধীর বাবু মুক্তি পেয়ে তো আসছেন—এই ক'টা দিন অপেক্ষা করা বৈ তো নয়।

নীরেন বিষাদের হাসি হেসে বললে—অপেক্ষা অঞ্জলি করতে জানে। কিন্তু যার অপেক্ষায় সে দিন গুনবে, সে-ই যে অপেক্ষার অতীতে চলে গেছে।

রাবেয়া দৃঢ়স্বরে বললে—তাহ'লে সুধীরবাবুর অন্যায় হ'বে। অঞ্জলির মত রত্নকে অবহেলা করা যে তার পক্ষে পাপ।

নীরেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বললে—সবাই কি রত্ন চিনতে পারে রাবেয়া? জীবনে যে মেকি জিনিষ পেয়েই এসেছে সে খাঁটি রত্নকেও মেকির কোঠায় ফেলে। ভালোকে চিনবার ও বুঝবার দৃষ্টি থাকা চাই।

রাবেয়া বললে—অঞ্জলি সুধীরবাবুকে সেই দৃষ্টি দান করতে পারতো।

কথা বলতে বলতে দুজনেই অঞ্জলির ঘরে ঢুকলো। অঞ্জলি জানলার কাছে একটা ইজিচেয়ারে বসে অদূরের রাস্তার দিকে

তাকিয়ে ছিলো। পায়ের শব্দ শুনে অঞ্জলি পিছনে তাকিয়ে দেখলো নীরেন ও রাবেয়া। সে তাদের চৌকিতে বসতে ইঙ্গিত করলো। তারা দুজনেই বসলো।

নীরেন তিরস্কারের সুরে অঞ্জলিকে বললে—অঞ্জলি, তুমি নিজের দেহকে এমনিভাবে স্বেচ্ছায় ক্লেশ দাও কেন? একটু যত্ন নেওয়াতো কর্তব্য।

অঞ্জলি বুঝলে যে তার মা নিশ্চয়ই নীরেন ও রাবেয়াকে কিছু বলেছেন। সে শুধু অলসভাবে বললে—যত্ন, যত্নের অভাবতো আমি কোন দিনই করিনি, নীরেনদা। কিন্তু এখনও কি করতে বলো, নীরেনদা?

নীরেন বললে—আমি শুধু ভাবছিলাম যে নিজের প্রতি অবিচার করবার তোমার অধিকার আছে কি-না।

অঞ্জলি বললে—তুমি যে অধিকারের কথা বলছো, নীরেনদা, সে সমস্ত আমার জীবনে ঘুচে গেছে। আজ আমি বন্ধুহীন ও অধিকারচ্যুত। আজ আমার কোন অপরাধ নেই—অপরাধের অতীতে আমি।

রাবেয়া বললে—তোমার দিক্ ভাবলেইতো হ'বো না, অঞ্জলি। সুধীরবাবুর দিকও তো তোমার ভাবতে হ'বে।

অঞ্জলি মৃদুমধুর হেসে বললে—তিনি তাঁর কোন ভাবনা আমার কাছে রেখে যাননি বলেইতো আমার আজ এতো অভিযোগ। তাঁর ভাবনার বোঝার থেকে মুক্তি পেয়ে আজ আমি বন্দী, রাবেয়া। জীবনে তুই যেন মুক্তি না পাস্, নিশ্চিন্ত

যেন না হ'তে পারিস্, চিন্তা ভাবনা যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে না যায়।

নীরেন একটা ছোট্ট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—অঞ্জলি, জীবনে সুখী হ'তে না পারলেও নিজকে সুখে রাখতে চেষ্টা করো, এই আমাদের ইচ্ছা।

অঞ্জলির চোখ দুটো বড় হয়ে জল জল করে উঠলো। নীরেনের দিকে একদৃষ্টে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তারপর মনে মনে বললে—তোমার ইচ্ছা!

অঞ্জলি আবার চোখ বুজে ধীরে ধীরে বললে—নীরেনদা, পুরুষ মানুষ যদি আমাদের ভুল বোঝে, কোন উপায়ই আমাদের থাকে না। আমাদের সমস্ত প্রেম তাদের এক নিমেষের ভুল বুঝাতে ডুবে যায়। আচ্ছা, নীরেনদা, বল তোমরা কি আমাদের সত্যিই বিশ্বাস করো না?

নীরেন সান্ত্বনার সুরে বললে—তোমার ভালবাসা যে পেয়েছে সে ভাগ্যবান; তোমাকে যে অবিশ্বাস করেছে, সে ভাগ্যহীন, জীবনে সে কখনো সুখী হ'তে পারবে না।

অঞ্জলি বললে—মানুষ ভালবাসা অযাচিতভাবে পেলে তার মর্য্যাদা বোঝে না। তাই আমি স্বেচ্ছায় যা দিলুম, অযাচিতভাবে তিনি যা পেলেন—নিঃসঙ্কোচে তিনি তা অবহেলা করে চলে গেলেন। আমি নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলুম বলেই আজ আমার এতো অপমান—তিনি যদি আমার কাছে আসতেন, এই অবহেলা আমার পক্ষে সম্ভব হ'তো না।

পুরুষের জয়গান কি মিথ্যা, আজ শুধু সেই কথাই মনে পড়ছে, নীরেনদা।

নীরেন বললে—সব পুরুষতো আর সমান নয়।

অঞ্জলি বললে—তা' জানি কিন্তু তা' মানতে আজ মন সরচে না। আমার জীবনের এই ব্যর্থতা পুরুষের দান। অথচ সমাজের আইনে তাঁর কোন শাস্তিই পেতে হ'বে না। আর আমরা যেখানে আইন অমান্য করেছি, সমাজ সেখানে ছি ছি রবে মুখর হ'য়ে উঠেছে। নীরেনদা, আমাদের ব্যর্থতার অভিশাপ কি সমাজকে স্পর্শ করবে না?

রাবেয়া বললে—করবে বৈ কি! আঘাত দিয়ে যারা পৌরুষ দেখায়, অভিশপ্ত হ'বে তাদের জীবন।

অঞ্জলি বাধা দিয়ে বললে—না, না, অভিশাপ দিয়ে আমরা নিজেকে ছোট করবো না। পুরুষ যদি আঘাত দিয়েই নিজেকে সার্থক মনে করে, জয় হোক্ তার পৌরুষত্ব।

নীরেনের প্রাণ ব্যথায় কেঁপে উঠলো। তার শুধু মনে হতে লাগলো যে অঞ্জলি সুবীরকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে অন্যায় করেছে। তাই সে মেয়েদের এই জীবন নিয়ে জুয়াখেলাকে তারিফ করতে পারলো না।

পুরুষের বিরুদ্ধে রাবেয়ার মন বিষিয়ে উঠলো—কিন্তু মনে মনে নীরেনের প্রতি সে সোহাগে টলমল করে উঠলো।

ব্যর্থতার মুকুরে অঞ্জলি আজ নীরেন-রাবেয়ার কাছে পূর্ণ প্রতিফলিত হ'লো।

সেই দিন রাবেয়াদের বাড়ী থেকে এসে বিজয় একমাস ঘর থেকে বেরোয়নি, কলেজে যায় নি, সহপাঠিরা এসে উৎপাত করেছে, নীরবে সে তা সহ্য করেছে। যে-বিজয় বাইরে সারাদিন কাটিয়ে দিতো, সে হঠাৎ আজ ঘরে বন্ধ হওয়াতে সবারই নজর পড়লো। বিজয়ের মা ব্যাপারটা বুঝলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। তিনি একবার বিজয়কে পাড়ার একটি মেয়েকে বিয়ে করতে বলেছিলেন, বিজয় তখন তার পণ জানিয়েছিলো যে সে বিয়ে করবে না। বিজয়ের সেই অস্বীকার মা'র মনে বেজেছিলো, তিনি সেই ঘটনার পর থেকে আর বিজয়কে বিবাহ ব্যাপারে কোন অনুরোধ জানাননি। কিন্তু বিজয়ের অস্বীকারের দুর্গ যে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে তা বিজয়ের মা জেনেও জানলেন না।

মনীষা একদিন বললে—দাদা, তুমি যোগ অভ্যাস আরম্ভ করছো না কি? কলেজ ছেড়েছো, বন্ধু ত্যাগ করেছো, এমন কি রাবেয়ার সঙ্গও ছেড়ে দিয়েছো! হঠাৎ তোমার হ'ল কি!

মনীষা একটু হাসলো।

বিজয় গম্ভীরভাবে বললে—মাকে বলে দিস্ যে আমি আর এম, এ পড়বো না। এম, এ পড়ে শুধু খরচ বাড়িয়ে লাভ কি!

মনীষা চোখে হাসি টেনে বললে—হঠাৎ রাবেয়ার বিয়ের

পর তোমার এই 'একনমি' জ্ঞান বাড়লো না কি? রাবেয়ার ব্যাঙ্কে কি তোমার ফিক্সড্ ডিপজিট্ ছিলো যে তার সুদে তোমার পড়ার খরচ চলে যেতো? সেই ব্যাঙ্ক আজ ফেল পড়েছে, কি বলো দাদা?

বিজয় সহজসুরের বললে—ব্যাঙ্ক ফেল পড়লেও কিছু টাকা পাওয়া যায়। এতোদিন রাবেয়া ছিল লিমিটেড কোম্পানি, ম্যানেজিং এজেন্সি হিসাবে আমাদের আদর ছিলো, কিন্তু আজ সেই কোম্পানির সব সত্ব একজনের হাতে গিয়ে পড়েছে, ম্যানেজিং এজেন্টরাও গেলো, সেয়ারহোল্ডারের দলও ঠক্‌লো।

মনীষা বিস্মিত হ'য়ে বললে—এই সত্ব বদলাবার চক্রান্ত তোমরা টের পাওনি!

বিজয় বললে—সেথানেইতো এর রহস্য। প্রোপ্রাইটরি কারবারের রিস্‌ক্ যে রাবেয়া সখ করে কেন নিলে, তা আজও আমার কাছে অবিদিত।

মনীষা হেসে বললে—হয়তো ম্যানেজিং এজেন্টের দল সমস্ত বিষয়টা "মিস্‌ম্যানেজ্" করছিলো।

বিজয় শুধু বললে—হয়তো হ'বে।

তার মন ব্যথায় কেঁপে উঠলো।

বিজয় রাবেয়াকে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলো। সে-চিঠির কোন উত্তর আসেনি। বিজয় নীরেনদের বাড়ীতে রাবেয়ার সঙ্গে এক দুপুর বেলায় দেখা করতে গিয়েছিলো। রাবেয়ার বেয়ারা এসে জানিয়ে দিয়ে গেলো যে সাহেব বাড়ী নেই ব'লে মেম্‌সাহেবের

সঙ্গে দেখা হ'বে না। বিজয় এর কোন উত্তর খুঁজে পায়নি। যে-রাবেয়া কিছুদিন আগে বিজয়ের হাতের মুঠোর ভিতর ছিলো, সে আজ একাকী দেখা করতে অনিচ্ছুক! বিবাহিতা রাবেয়া কুমারী রাবেয়ার জীবনকে অস্বীকার ক'রে এগুতে লাগলো। বিজয় নারী হৃদয়ের ষড়যন্ত্রে শিউরে উঠলো।

একদা এক বিয়ের বাড়ীতে বিজয় ও রাবেয়ার দেখা হ'য়েছিলো। রাবেয়া এমন ভাবে তখন মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলো যে বিজয় বুঝলো সব কিন্তু রাবেয়াকে কোন কথা জানাতে পারলো না। ঔদাসীন্য ও অবহেলার আঘাতে রাবেয়া বিজয়কে খান্ খান্ করে ফেললো। রাবেয়া জানে যে বিজয় হ'লো তার কুমারী জীবনের অপরাধের নিশানা—সেই নিশানা ধূলিলুণ্ঠিত না হ'লে তার বিবাহিত জীবন পুষ্পিত হ'য়ে উঠতে পারবে না। রাবেয়া জানে যে যদি কোন অজুহাতে বিজয় রাবেয়ার বিবাহিত জীবনের রাজপথে কোন মুহূর্তে এসে দেখা দেয়, অথবা বিঘ্ন ঘটায়, তার ছন্দোবদ্ধ চলার তাল কেটে যাবে। রাবেয়া নিজের জীবনের বাধা কাটাতে গিয়ে কাউকে বাধা দিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। তাই সে দয়াহীন ব্যবহারে বিজয়কে জীর্ণ করে তুললো।

মনীষা একদিন বললে—রাবেয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, তার ইচ্ছে যে তোমার সঙ্গে তার আর দেখা না হয়। এই কঠিন কথাটা তোমাকে বলবো না, ভেবেছিলাম। কিন্তু যে অসম্মানের বোঝা রাবেয়া তোমার মাথায় চাপিয়ে দিতে চায় তার দাগ যে আমাদেরও লাগে, তাই তোমাকে বললাম।

বিজয় বিস্মিত হ'য়ে বললে—অসম্মান যেখানে সুনিশ্চয়, সেই দুয়ারে আমি ভিক্ষা চাইতে যাবোনা। কিন্তু হঠাৎ রাবেয়ার এই অসম্মান বোধ জাগলো কেন?

মনীষা বললে—বড়লোকের স্ত্রী হ'য়েছে বলে বোধ হয়।

বিজয় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—মনীষা, তোদের বিয়ে হ'লে কি তোরা আগের জীবনকে একদম ভুলে যাস্? কুমারী জীবনের কোন ঘটনাই কি তোদের বিবাহিত জীবনকে বিচলিত করে না?

মনীষা হেসে বললে—ঘটনায় মলিনতা থাকলে ভোলবার চেষ্টা থাকা স্বাভাবিক।

বিজয় গম্ভীর হ'য়ে গেলো। তার মনে পড়লো যে রাবেয়াকে সে কি নিবিড়ভাবে পেয়েছিলো এবং আজ রাবেয়া তাকে কি কঠিনভাবে ত্যাগ করেছে। পাছে সে মনীষার কাছে ধরা পড়ে, তাই হেসে বললে—মেয়েদের তাহ'লে নিষ্ঠুর বলতে হবে।

মনীষা স্বীকার করলো।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলো।

হঠাৎ বিজয় বললে—মনীষা, তুই বিয়ে করবিনে? প্রশ্ন শুনে মনীষা একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। মনীষার এক[illegible] প্রফেসার মনীষাকে খাতির করে। ইউনিভার্সিটি মহলে একটা রবও উঠেছিল যে অধ্যাপকটি মনীষাকে বিয়ে করবে। মনীষা জানতো না যে, অধ্যাপকের স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব কি-না। মনীষা অধ্যাপককে বাধা দিতো না পরীক্ষার

সুবিধের জন্তে এবং অধ্যাপক প্রেম জানাতো মনীষাকে পাবার জন্ত। এই টানাটানিতে ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়েছিলো—শিক্ষকের ধর্ম অধ্যাপকটি স্বেচ্ছায় অবহেলা করে প্রেমিকের স্থান অধিকার করবার চেষ্টা করছিলো। তাই নিম্নস্বরে মনীষা বললে—কেন, আমিতো বলেছি যে আমি বি, এ পরীক্ষার পরে বিয়ে করবো। কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমার বিয়ে করা চাই।

বিজয় বললে—তা-কি হয়!

তারপর একটু হেসে বললে—ঠিক করেছি যে আমি বিলেত যাবো। আমার তো এখন বিয়ে করা চলবে না।

মনীষা বললে—কেন, বিলেত যাবার আগে তো অনেকেই বিয়ে করে যায়। মা'কে বলেছো যে তোমার যাবার ইচ্ছে আছে?

বিজয় বললে—তুই জানিয়ে দিস্।

মনীষা বুঝলো যে বিজয়ের বিলেত যাওয়া সখে নয়, বিলেতী ডিগ্রীর লোভে নয়, জ্ঞানের পিপাসায় নয়—এ শুধু রাবেয়াকে এড়াবার জন্তে। রাবেয়া যে বিজয়ের জীবনের একটা বড়ো স্থান অধিকার করেছিলো, সে কথা মনীষা জানতো। কিন্তু কেন, এবং কোন্ ঘটনার সংযোগে, রাবেয়া নীরেনকে বিয়ে করলো, তা মনীষা জানতো না। জানবার কৌতূহলও হয়নি, কারণ নীরেনকে পেলে রাবেয়া যে বিজয়কে অবহেলা করবে, সে কথা যেন মনীষা জানতো। অথচ এতো জানা কথাও যখন ফললো, তখন মনীষা রাবেয়াকে ক্ষমা করতে পারলো না; তার মনে হ'লো রাবেয়া যেন অন্তায় করেছে।

বিজয়ের বিলেতে রওনা হবার দিন এগিয়ে এলো। বিজয়ের মা'র ইচ্ছে ছিলোনা কিন্তু মনীষা ও বিজয় চেষ্টা করে মা'র সম্মতি গ্রহণ করেছে। বিজয় প্রচার করে দিলো যে সে বিলেত গিয়ে "একাউন্টেন্সি" পড়বে। বন্ধুরা পরামর্শ দিলো যে দেশে কোন ফার্মে কাজ শিখে বিলেতে গিয়ে পরীক্ষা দিতে। বিজয় বললে যে তাতে শিক্ষার ইমারত পোক্ত হয় না—দেশে থেকে কাজশেখা মানে ফাঁকি দেওয়া। দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে বিজয়ের এরূপ বিকৃত ধারণা ছিলো না। কিন্তু হঠাৎ তার দেশীয় জিনিসের প্রতি অশ্রদ্ধা মুখেচোখে উপ্‌চে পড়তে লাগলো।

বিজয়ের মনে হ'লো যে দেশ ত্যাগ করবার আগে একবার সে রাবেয়ার সঙ্গে দেখা করে যাবে। মনে মনে বিজয়ের এরূপ কল্পনাও ছিলো যে য়ুরোপে যদি রাবেয়ার মতো নিষ্ঠুর ব্যবহার না পায়, তাহলে সেখানেই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ কাটিয়ে দেবে। বাঙালীমেয়েদের ছলনা দেখে বিজয় কঠিন হ'য়ে উঠেছে। রাবেয়াকে বাংলাদেশের মেয়ে জাতের প্রতীক ভেবে সে মনে মনে মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক কিছু ভেবে নিয়েছে। মেয়েদের বিরুদ্ধে এতো সব ভাবা সত্বেও বিজয়ের একবার ইচ্ছে [illegible]লো রাবেয়ার সঙ্গে দেখা করে যাবে।

একদা মনে মনে রাবেয়ার আচরণকে ক্ষমা করে বিজয় রাবেয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেলো। সেদিন ছিল দ্বিপ্রহর—সাধারণতঃ সেই সময় নীরেন বাসায় থাকেনা। এবং নীরেন বাসায় ছিলোও না। কম্পিত বক্ষে বিজয় রেবেয়ার কাছে

কার্ড দিলো। রাবেয়া বেয়ারার মারফতে জানালো সন্ধ্যাবেলায় আসতে। তার মানে, নীরেনের সঙ্গ ব্যতীত রাবেয়া বিজয়ের সঙ্গে দেখা করবেনা। বিজয়ের প্রথমটা রাবেয়ার পতি-নিষ্ঠা দেখে হাসি এলো। তারপর হঠাৎ বিজয়ের সর্ব্বশরীর দুঃখে ও ঘৃণায় কাঁপতে লাগলো। একবার মনে হ'লো যে সে এখনি চলে যায়—রাবেয়াদের বাড়ী ছেড়ে, রাবেয়াদের দেশ ছেড়ে, রাবেয়াদের কল্পনার বেষ্টন ছেড়ে। কিন্তু যেতে সে পারলোনা। প্রাচীন স্মৃতি তাকে আরও অসম্মানের পথে এগিয়ে দিলো।

বিজয় কার্ডের উপর অনুরোধ জানালো যে সে একটিবারের জন্যে দেখা ভিক্ষা করছে। একথা জানাতেও সে ভুললো না যে এই হ'বে তার শেষ দেখা, কারণ সে শীঘ্রই বিলেত চলে যাচ্ছে।

প্রার্থনা মঞ্জুর হ'লো। রাবেয়া দেবী এলেন। তার আপাদ-মস্তক একটা র‍্যাপারে জড়ানো—এমন ভাবে জড়ানো যে মুখ ছাড়া তার দেহের কোন অংশই দেখা যায় না। মনে হ'লো যে রাবেয়া যেন কোন এক মাংসপ্রিয় হিংস্র জন্তুর কাছে এসেছে—তাই দেহের মাংসপেশীগুলি এতো সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে। মনে হ'লো বিজয় যেন রাবেয়ার দেহের কোন ভগ্নাংশ দেখলেই হিংস্র হ'য়ে উঠবে, তাই এতো সাবধান!

রাবেয়ার সযত্নে আবৃত দেহ, মৌনমূর্ত্তি দেখে বিজয়ের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলি টন্‌ টন্‌ করে উঠলো। তার মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। একবার ভাবলো রাবেয়ার কাছে গিয়ে তার দেহস্পর্শ করে সে জিজ্ঞাসা করে, তার এই ঘৃণিত

আচরণের, এই নিষ্ঠুর আঘাতের হেতু কি ? আরও জিজ্ঞাসা করে যে তার এই শুচিজ্ঞান ও নিষ্ঠাবোধ কবে থেকে হ'লো ? কিন্তু পরক্ষণেই বিজয়ের সমস্ত শরীর ঘৃণায় কুঁচ্‌কে গেলো—কথা বলতে সে অসম্মান বোধ করলো। তাই রাবেয়াকে শুধু একটি ক্ষুদ্র নমস্কার দিয়ে সে চলে আসতে চাইলো।

রাবেয়া প্রশ্ন করলো—আপনার কিছু বলবার আছে ?

প্রশ্ন শুনে বিজয় একবার থমকে দাঁড়ালো, তারপর সে কঠিন ভাবে চলে এলো।

চতুর্দিকে নিঝুম দুপুরের স্তব্ধতার সঙ্গীত রাবেয়ার বুকেও কাঁপন এনে দিলো।

বিজয়ের বিলেত যাওয়ার ঘটনা খবরের কা[illegible] মারফতে রাবেয়া জেনেছিলো।

নীরেন একদিন রাবেয়াকে লক্ষ্য করে [illegible] —বিজয়বাবু যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করে যান্ নি ?

রাবেয়া নীরেনকে একটি চুম্বন দিয়ে বললে[illegible] অঞ্জলির অসুখ বেড়েছে, জানো ?

নীরেন বিজয়ের কথা ভুললো—অঞ্জলির সম্বন্ধে তাদের আলাপ চলতে লাগলো। নীরেনের ও রাবেয়ার জীবনে অঞ্জলির ছিলো শ্রেষ্ঠ স্থান।

অঞ্জলির জ্বর হয়েছে শুনে রাবেয়া তাকে দেখতে এলো। রাবেয়ার কাছে অঞ্জলি দেবীর স্থান অধিকার করেছে।

রাবেয়া ঘরে এসে অঞ্জলির গায়ে হাত দিয়ে বললে—তোমার জ্বর বেড়েছে?

অঞ্জলি বললে—এ জ্বর তো ছাড়বার নয়, ভাই। তাই বেড়েছে বলে আর মনে ক্ষোভ করিনে।

রাবেয়ার চোখ সজল হ'য়ে এলো। সে স্নেহের সুরে বললে—ওসব অলক্ষুণে কথা বলতে নেই। সুবীরবাবু এসে তোমার সব দুঃখ দূর করবেন। এখন অনুতাপ করে নিজের অপরাধ বাড়িয়োনা।

অঞ্জলি ম্লান হাসি হেসে বললে—অপরাধ! যেখানে অপরাধের ক্ষমা নেই, সেখানে ভাই সহজভাবে বিচরণ করা যায় না। সেদিন আলিপুর জেল থেকে সংবাদ এসেছে যে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনিচ্ছুক। সাক্ষাৎ পাবার আবেদন গবর্ণমেন্ট মঞ্জুর করেছিলো কিন্তু স্ত্রীর একান্ত অনুরোধ স্বামী অনুমোদন করতে পারলোনা।

রাবেয়া অঞ্জলিকে আদর করে বললে—নিজের উপর কঠিন শাস্তি স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়োনা। ভুল বোঝা আরম্ভ হ'লে তা'র শেষ নেই, তাই গোড়ায় একটু উদারতা থাকা ভালো।

অঞ্জলি ধীরে ধীরে চোখ বুজলো। তার মুখখানা আরও বিমর্ষ হ'য়ে গেলো।

হঠাৎ অঞ্জলি ব'লে উঠলো—আচ্ছা রাবেয়া, আমি যে দেহকে পীড়ন করে দেহের শুচিতা রক্ষা করছি, এর কি কোন মূল্য নেই? যার কাছ থেকে শাস্তি গ্রহণ করেছি, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার জন্যে এই দেহকে সমস্ত কৃচ্ছ্রতা ভোগ করতে হ'য়েছে, এতে কি আমার অন্যায় হচ্ছে, রাবেয়া?

রাবেয়া অঞ্জলির সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললে—পুরুষের প্রয়োজন নিষ্ঠা, দেহের শুচিতার দিকে তাদের লোভ কেন?

অঞ্জলি বললে—দেহের মন্দিরে অপরের বাতি জ্বললে, পূজারীর একনিষ্ঠ সাধনা ব্যাঘাত পেতে পারে।

রাবেয়া চুপ করে রইলো।

অঞ্জলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—মনে কতো কথা জাগে, কতো ব্যথা ফোটে কিন্তু শুধু শুচিতার খাতিরে সংস্কারের শ্রদ্ধায় দেহের সমস্ত "প্যাসনকে" থেৎলে দিয়ে এসেছি, এই দেহ ও মনের সংঘাতে কতো ব্যথা পেয়েছি, কিন্তু সমস্ত সহ্য করেছি যাঁর জন্যে, শুধু তাঁকেই আজ পেলাম না। আজ দেহের সমস্ত "প্যাসন" যখন শুকিয়ে গেছে, মন যখন অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে, তখন মনে হয় যে এই সুন্দর পৃথিবীতে নিজের ভাগে কিছুই গ্রহণ করলেম না; শুচিতার প্রলোভনে সংস্কারের তাপে নিজেকে দগ্ধ করে ছারখার করে দিলেম। মনে মনে অহঙ্কার ছিলো নিজের আত্মসংযমের উপর, আজ মনে হচ্ছে যে এই সংযমের কি কোন প্রয়োজন ছিলো?